খুদে প্রতিভা • নতুন খেলা • আমার কুইজ় • শব্দসন্ধান
আনন্দমেলা
৫ জুন ২০২৩
বেড়ানো
জয়পুরে লেপার্ডের মুখোমুখি
কমিক্স
রেডি-স্টেডি-গো
ডিগবাজি
খেলাধুলো
জিতলেন ধোনি
হাফ ডজন গোয়েন্দা গল্প
ইন্দ্রনীল সান্যাল
সৈকত মুখোপাধ্যায়
রাজেশ বসু
অনীশ মুখোপাধ্যায়
জয়দীপ চক্রবর্তী
অঙ্কন মিত্র
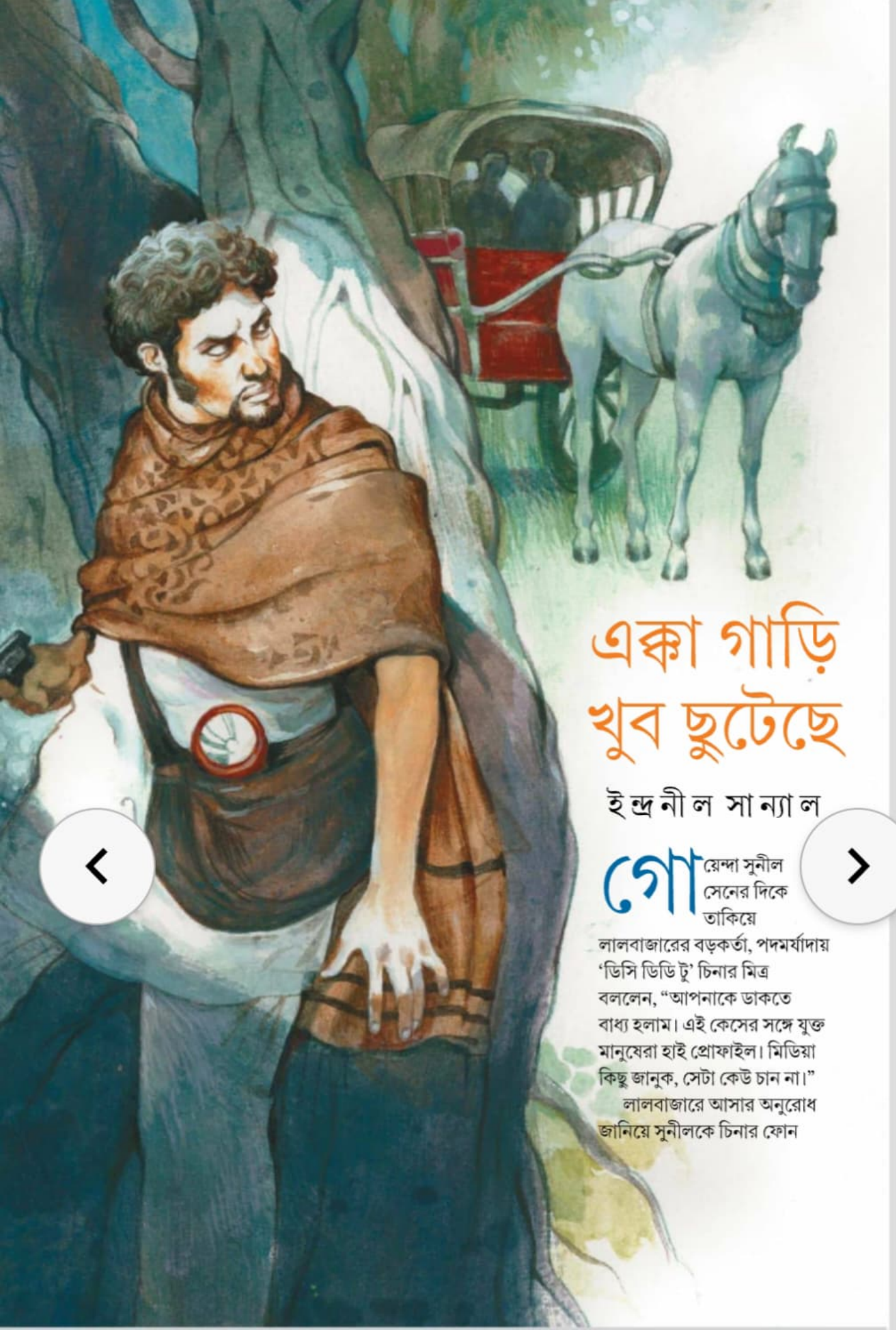
এক্কা গাড়ি খুব ছুটেছে

ইন্দ্রনীল সান্যাল

গোয়েন্দা সুনীল সেনের দিকে তাকিয়ে লালবাজারের বড়কর্তা, পদমর্যাদায় 'ডিসি ডিডি টু' চিনার মিত্র বললেন, "আপনাকে ডাকতে বাধ্য হলাম। এই কেসের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা হাই প্রোফাইল। মিডিয়া কিছু জানুক, সেটা কেউ চান না।"

লালবাজারে আসার অনুরোধ জানিয়ে সুনীলকে চিনার ফোন

লালবাজারে আসার অনুরোধ জানিয়ে সুনীলকে চিনার ফোন করেছিলেন সকাল ন'টার সময়। পুলিশের অনুরোধ মানে আদেশ। চিনার গাড়ি পাঠিয়েছিলেন। সকাল দশটার সময় সুনীল আর চিনার মুখোমুখি।

"কাল রাত আটটা নাগাদ বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সুপারস্টার রাজেশকে গুলি করে মারার চেষ্টা হয়," বললেন চিনার, "একাধিক সন্দেহভাজন ব্যক্তি রয়েছেন। প্রত্যেকেই নামজাদা। রাজেশ চাইছে না যে, এটা নিয়ে মিডিয়া বা সোশাল মিডিয়ায় জলঘোলা হোক। তবে ও পুলিশের কাছে সুরক্ষা চেয়েছে। সেটা আমরা অবশ্যই দেব। তার আগে জানতে হবে, এটা কি কোনও অর্গানাইজড র‍্যাকেটের কাজ? না ব্যক্তিগত প্রতিশোধ! আপনি আর আমি এখন রাজেশের আলিপুরের বাড়ি যাব। ওখানে সন্দেহভাজনরা উপস্থিত। আপনি যা জিজ্ঞাসা করার, করবেন।"

"সাসপেক্টরা এত বড় ভিআইপি যে, পুলিশের কাছে মুখ খুলবেন না?"

"তাঁদের মধ্যে রাজেশের ছেলে নবীন আর বউ পাপিয়াও আছে," চেয়ার থেকে উঠলেন চিনার, "আমরা পুলিশি চিহ্নওয়ালা গাড়িতে যাচ্ছি না। আনমার্কড কার-এ যাব।"

"ফিল্মস্টারের বাড়ির লোককে এত খাতির কেন? হাজার হোক এটা অ্যাটেম্পট টু মার্ডার।"

"রাজেশ আমার মাসতুতো দাদা," হাসলেন চিনার, "আমি ওকে রাজেশদা বলি।"

দু'জনে ডিসি ডিডি-র কেবিন থেকে বেরিয়ে এক তলায় নেমে একটি সাদা রঙের গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি চালাচ্ছেন পুলিশের চালক কালীপদ মুর্মু। তিনিও পুলিশি উর্দি পরে নেই।

চিনার বললেন, "কালীপদ, রেড রোড হয়ে চলো।"

গাড়ি চলতে শুরু করল।

"সিসিটিভি ফুটেজের কী খবর?" প্রশ্ন করলেন সুনীল।

"রেড রোডের মাত্র কয়েকটা পয়েন্টে ক্যামেরা আছে," বললেন চিনার, "সেগুলো হয় খারাপ, না হয় চুরি হয়ে গেছে। কোনও ফুটেজ নেই।"

ধর্মতলার যানজট কাটিয়ে রেড রোডে পৌঁছেছে গাড়ি। চিনার হঠাৎ বললেন, "দাঁড়াও।"

গাড়ি দাঁড় করালেন কালীপদ। রাস্তায় নেমে নিজের স্মার্টফোনের ফটো গ্যালারি খুলে সুনীলকে দেখালেন চিনার, "এটাই ক্রাইম সিন। আমার টিম কাল রাতে জায়গাটা ছানবিন করে গেছে।"

একের পর এক ফটোয় দেখা যাচ্ছে একটি এক্কা এবং তার মাঝবয়সি চালক দাঁড়িয়ে। ফটো দেখতে দেখতে সুনীল বললেন, "অ্যাটাকের কত ক্ষণ পরে ফটোগুলো তোলা?"

"রাজেশদার হাতে গুলি লাগার পরে এক্কাটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের প্রধান ফটকের সামনে চলে যায়। সেখান রাজেশদার গাড়ি ছিল। নবীন গাড়িতে অপেক্ষা করছিল। সে যখন গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছে, তখন রাজেশদা আমাকে ফোন করে। আমিই বাড়িতে ডাক্তার পাঠাই। গুলিটা বাঁ হাত ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে। দুটো সেলাই আর ব্যান্ডেজেই ঝামেলা মিটেছে। আমার টিম সেই সময় ক্রাইম সিন তদারক করতে এখানে এসেছিল। এই ফটোগুলো গুলি চলার দু'ঘণ্টা পরে তোলা," একটু থেমে চিনার বললেন, "ক্রাইম সিন থেকে খানিকটা দূরে, গড়ের মাঠের ঘাসের মধ্যে একটা 'ওয়ান শটার' পেয়েছে। বুলেট পাওয়া গেছে রেড রোডের ও পারে। বুলেট ও গান মিলে গেছে।"

ওয়ান শটার হল দিশি পিস্তল, যার থেকে একটিই কার্তুজ বেরোয়।

ট্রাম লাইনের পাশের নর্দমা শীত কালে শুকিয়ে খট খট করছে। সেটা টপকে গড়ের মাঠের ঘাসে হাঁটছেন সুনীল। চিনারের কথা শুনে বললেন, "পিস্তলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে?"

"না," গাড়িতে উঠছেন চিনার, "এর মানে হল অপরাধী গ্লাভস পরেছিল বা হাতে কিছু জড়িয়ে নিয়েছিল।"

হাতে গ্লাভস পরে নর্দমা থেকে একটা ফুলছাপ রুমাল তুলে সুনীল বললেন, "এটা আপনার টিম দেখেনি?"

"কী ওটা?"

গাড়িতে উঠে সুনীল বললেন, "রুমালে কালিঝুলি লেগেছে। মনে হচ্ছে পিস্তল ব্যবহার করার সময় হাতে জড়িয়ে নিয়েছিল। কাজ মিটে যাওয়ার পরে পিস্তলটা দূরে ছুড়ে রুমালটা এখানে ফেলে যায়। এটা আপনার ফরেন্সিক টিমের কাছে পাঠান। কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে দেখতে বলুন পিস্তলের কেমিক্যালের সঙ্গে মেলে কি না।"

চিনার একটা ফোন সেরে কালীপদকে বললেন, "ময়দান থানা হয়ে চলো।"

গাড়িতে স্টার্ট দিলেন কালীপদ। তাঁকে চিনার জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি জর্দাপান খাও?"

কালীপদ লাজুক হেসে বললেন, "খাই স্যর। সুপুরি, এলাচ আর জর্দা। তবে এখন খাইনি।"

ময়দান থানার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বড়বাবু। তাঁর হাতে এভিডেন্স সংগ্রহ করার

প্লাস্টিকের পাউচ। পাউচের মধ্যে রুমালটি ফেললেন সুনীল। মার্কার পেন দিয়ে পাউচের উপরে তথ্য লিখে বড়বাবু বললেন, “এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি স্যর।”

মিনিট পনেরো পরে আলিপুরের একটি প্রাসাদোপম বাড়ির গেট দিয়ে গাড়ি ঢোকালেন কালীপদ। দু’বার নাক টেনে গাড়ি থেকে নামলেন সুনীল।

{২}

রাজেশের দোতলার শোয়ার ঘরটি সিনেমার সেটের মতো। সেই ঘরে, আরামকেদারায় বসে সেলফি তুলছেন রাজেশ। দু’জনকে ঢুকতে দেখে ভারী গলায় বললেন, “বসুন।”

সুপারস্টার হওয়ার সব যোগ্যতাই রাজেশের আছে। তিনি রূপবান, ফরসা, স্মার্ট, ব্যারিটোন কণ্ঠস্বরের অধিকারী। একটাই খামতি। উচ্চতা পাঁচ ফুট দু’ইঞ্চি।

চেয়ারে বসে সুনীল বললেন, “গত কাল যে কিলার আপনাকে টার্গেট করেছিল, তাকে খুঁজে বের করার জন্যে আপনার সাহায্য সব চেয়ে বেশি জরুরি। আপনি বিশদে সব বলুন। কিছু বাদ দেবেন না।”

রাজেশ বললেন, “আমার প্রোডাকশন হাউসের নাম ‘দত্ত ফিল্মস’। এই ব্যানারে নতুন একটা ছবি বানাচ্ছি। আমিই ছবির হিরো। পঞ্চান্ন বছরে বয়সে নাচ-গান করা যাবে না বলে ছোটদের জন্যে গল্প বেছেছি। ছবির নাম ‘অন্ধকারের অশ্বারোহী’। পুরনো কলকাতার পটভূমিতে এক্কা চালকের কাহিনি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে অনেক এক্কা আর টাঙ্গা দাঁড়িয়ে থাকে। আমি আর আমার বৌ গত কয়েক মাস ধরে সপ্তাহে এক বার বা দু’বার রাতের দিকে এক্কায় উঠছি। এক্কা কাকে বলে জানেন তো?”

“জানি,” বললেন সুনীল, “এক্কা হল এক ঘোড়ায় টানা দু’চাকার গাড়ি, যাতে এক জন বা দু’জন বসতে পারে। আর টাঙ্গা একই জিনিস, তবে এতে অনেক বেশি লোক বসতে পারে। এক্কা ট্যাক্সি হলে, টাঙ্গা পাবলিক বাস।”

“ভাল বললেন,” হাসলেন রাজেশ, “কাল রাতে ভিক্টোরিয়ার সামনে গাড়ি রেখে এক্কায় উঠেছিলাম। প্রাথমিক ভাবে এক্কা চড়া এনজয় করছি। পরে চালকের অনুমতি নিয়ে কয়েক মিনিটের জন্যে চালাচ্ছি। এর মাধ্যমে চরিত্রের ভিতরে ঢোকার জন্যে নিজেকে তৈরি করছি। গত কাল অবশ্য চালানোর সুযোগ পাইনি। রেড রোড দিয়ে যাওয়ার সময় গড়ের মাঠ থেকে কেউ আমাকে গুলি করে। কপাল ভাল যে বেঁচে আছি।”

“কাকে সন্দেহ করছেন?”

“আমার উপরে রাগ আছে এমন লোকের অভাব নেই। ফিনান্সিয়ার সাধন সাহা,

ঔপন্যাসিক প্রদীপ্ত বসু, আমার ছেলে নবীন বা বৌ পাপিয়া— কাউকে বাদ দিচ্ছি না। পাপিয়া অবশ্য এক্কায় আমার সঙ্গেই ছিল। কিন্তু এটা তো টাকার বিনিময়ে খুন। যে মারতে চায়, সে পাশে থাকতেই পারে।"

"এঁদের সন্দেহ করার কারণ?" সন্দেহভাজনের তালিকা শুনে বিস্মিত সুনীল।

"সেটা আপনি নিজে জানুন। এক তলার অফিসে বসে আপনি এদের সঙ্গে কথা বলুন। সাধন আর প্রদীপ্তকে ডেকে পাঠিয়েছি। পাপিয়া আর নবীন বাড়িতেই আছে।"

সুনীল চেয়ার থেকে উঠে বললেন, "প্রথমে আপনার স্ত্রীকে পাঠাবেন।"

{৩}

ট্রে-ভর্তি কুকিজ় আর দু'টি কফির কাপ নিয়ে অফিসে ঢুকলেন নীল শাড়ি পরা, বছর পঞ্চাশের পাপিয়া দত্ত। তাঁকে দেখে সুনীল বললেন, "আপনার তৈরি করা পরিবেশ-সংক্রান্ত একটি তথ্যচিত্র দেখেছি। 'দ্য আর্সেনিক ফাইল' তো খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ।"

চিনার ও সুনীলের হাতে কফির কাপ তুলে দিয়ে পাপিয়া বললেন, "কাজের কথায় আসা যাক। আমার কাছে কী জানতে চাইছেন?"

সুনীল বুঝলেন, পাপিয়া পেশাগত কথা বলতে নারাজ। তিনি বললেন, "আপনি কেন সন্দেহভাজনের তালিকায়?"

চিনারের দিকে তাকিয়ে পাপিয়া বললেন, "আপনি আমার শ্বশুরবাড়ির দিকের লোক। আপনার সামনে স্বামীর নিন্দে করা উচিত হবে?"

চিনার বললেন, "হবে বৌদি।"

"রাজেশ সাংঘাতিক রকমের মেগালোম্যানিয়াক। নিজের স্টারডম ছাড়া আর কিস্যু বোঝে না। একটা ছবি শেষ করেই পরের ছবিতে ঝাঁপ দেয়। আগের ছবির প্রযোজক, অভিনেতা বা নায়িকাকে বেমালুম ভুলে যায়। ছবি ফ্লপ করলে তাদের মোবাইল নম্বর ব্লক করে দেয়। সত্যি কথা বলতে কী, সেল্‌ফ অবসেস্‌ড স্টারদের পর্দাতেই ভাল লাগে। বাস্তব জীবনে এরা ভিলেনের চেয়েও খারাপ।"

চিনার বললেন, "বৌদি একটা তথ্যচিত্র বানাচ্ছেন রাজেশদাকে নিয়ে।"

"বানাচ্ছি বোলো না চিনার," ঝাঁঝিয়ে ওঠেন পাপিয়া, "রাজেশের হুকুমে বানাতে বাধ্য হয়েছি। 'আর্সেনিক টক্সিসিটি' নিয়ে আমার বানানো ডকুমেন্টারি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে। আমি কেন রিজিয়নাল স্টারকে নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক তথ্যচিত্র বানাতে যাব? অবশ্য, ঠান্ডা মাথায় ভাবলে, রাজেশের মতো খারাপ মানুষ কমই হয়। তা না হলে ছেলের প্রথম ছবি 'স্টোনম্যান রহস্য' সুপারহিট হওয়া সত্ত্বেও পরের ছবি 'অন্ধকারের অশ্বারোহী'-তে তাকে না নিয়ে, নিজেকে হিরো করে কোনও বাবা সিনেমা বানায়?"

সুনীল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "রাজেশ মারা গেলে ওঁর যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হবেন আপনি। তখন নিজের ইচ্ছে মতো ডকুমেন্টারি বা ফিচার ফিল্ম বানাতে পারবেন। এটা খুনের মোটিভ নয় বলছেন?"

আগুন-চোখে সুনীলের দিকে তাকিয়ে পাপিয়া বললেন, "চলন্ত এক্কা তাক করে গুলি চালানো হয়। সেটা আমার গায়েও লাগতে পারত। আমি মনে করি টার্গেট ছিলাম আমি। এক্কাটা সেই মুহূর্তে ঝাঁকুনি খেয়েছিল বলে বেঁচে গেছি।"

ভুরু কুঁচকে সুনীল বললেন, "সাধন সাহাকে পাঠিয়ে দিন।"

{৪}

ছ'ফুটের উপরে লম্বা, সাহেবদের মতো ফরসা, ষাটোর্ধ্ব সাধন সাহা পরে আছেন সাদা

টি-শার্ট ও সাদা জিন্‌স, পায়ে টকটকে লাল স্নিকার। দু'হাতের দশ আঙুলে দামি পাথর বসানো গোটা বারো সোনার আংটি। চেয়ারে বসে তিনি বললেন, "নমস্কার।"

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে সুনীল বললেন, "আপনি কেন সন্দেহভাজনের তালিকায়?"

"রাজেশ আমার দু'কোটি টাকা মেরে দিয়েছে। এখন ভাবতেই পারে যে টাকা আদায়ের জন্যে ভয় দেখিয়েছি।"

"আপনার দু'কোটি টাকা রাজেশ মেরে দিয়েছেন?" সুনীল অবাক! "কেন? কী ভাবে?"

"নবীনের প্রথম ছবিই সুপারহিট। ও দিকে রাজেশের লাস্ট তিনটে ছবি সুপারফ্লপ। আমি ফাইনান্স করেছিলাম ছবিগুলো। ছবির ভাল-মন্দ নিয়ে কথা বলার যোগ্যতা আমার নেই। ছবিতে টাকা ঢালি মুনাফা করার জন্যে। তা সত্ত্বেও বলেছিলাম, 'বুড়ো বয়সে নাচ-গানের শুটিংয়ের জন্যে সুইৎজ়ারল্যান্ড যেয়ো না। দার্জিলিং-এ সেরে নাও।' সে কথা শুনলে তো! আমি টাকা দিয়েছিলাম নগদে। কোনও কাগজপত্র নেই। ছবি ফ্লপ করার পরে টাকা চাইতেই আমার ফোন নম্বর ব্লক করে দিল।"

"ফিল্মে যাঁরা টাকা ঢালেন তাঁদের সাধারণত অন্য পেশা থাকে। আপনার পেশা কী?"

"আমার একাধিক জাহাজ আছে। অনেক রাইস আর অয়েল মিল আছে। কয়েকটা ঘোড়াও আছে।"

"ঘোড়া?"

"ওরা রেসের মাঠে দৌড়য়। সেখান থেকে ভালই রোজগার। তবে এটা আদতে স্টেটাস সিম্বল। আমার জীবনের দু'টি মাত্র চালিকাশক্তি। অর্থ আর যশ। ফিল্মে টাকা ঢাললে হিরো-হিরোইনদের সঙ্গে খবরের কাগজে ছবি ওঠে, টিভিতে মুখ দেখানো যায়। ফেম আমার ভাল লাগে। বাই দ্য ওয়ে, কালকের এক্কাটা যে ঘোড়া চালাচ্ছিল অতীতে আমি তার মালিক ছিলাম। তুফান এক সময় রেসের মাঠে দৌড়ত। বুড়ো হওয়ার পরে বেচে দিই। ও যে এখন এক্কা চালায়, সেটা জানতাম না।"

"রাজেশ কোন এক্কায় উঠেছিলেন সেটা কী করে জানলেন?"

"নীচে এসেছে তো এক্কাটা। সঙ্গে এক্কার মালিক আর তার ছেলে। ওটা বোধ হয় রাজেশ কিনবে। ওর গাড়ির খুব শখ।"

"কাল রাত আটটা নাগাদ আপনি কোথায় ছিলেন?"

"ফোর্ট উইলিয়ামের ব্যাঙ্কোয়েট হলে বিয়ের নেমন্তন্ন ছিল।"

"অর্থাৎ ক্রাইম সিনের কাছাকাছি ছিলেন। আচ্ছা, আপনি বন্দুক চালাতে পারেন?"

"অফ কোর্স! আমি সব সময় লাইসেন্সড গান ক্যারি করি।"

"লাইসেন্সড গান ইউজ় না করে ওয়ান শটার চালালেন কেন? দু'কোটি টাকা ফেরত দেওয়ার কথা মনে করাতে?"

পকেট থেকে ফুলছাপ সাদা রুমাল বের করে মুখ মুছে সাধন বললেন, "আমি ঘোড়া টিপলে মিস হত না। এখানে ঘোড়া বলতে হর্স নয়, ট্রিগারের কথা বলছি।"

সুনীল বললেন, "আপনি প্লিজ় প্রদীপ্ত বসুকে পাঠিয়ে দিন।"

{৫}

প্রদীপ্ত ঢোকার আগেই ঘরে ঢুকেছে বছর ষোলোর এক ছোকরা। কৈশোরের সারল্যের বদলে তার মুখে চোয়াড়ে ভাব। পরনে নোংরা টি-শার্ট আর ট্র্যাকসুটের লোয়ার। পায়ে

বদলে তার মুখে চোয়াড়ে ভাব। পরনে নোংরা টি-শার্ট আর ট্র্যাকসুটের লোয়ার। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। গা দিয়ে সিগারেট আর জর্দাপানের গন্ধ আসছে।

"কে আপনি?" পুলিশি ধমক দিলেন চিনার। ছেলেটি একটুও না-দমে বলল, "আমি বাবলু মণ্ডল। গরিব বলে যা খুশি তা-ই করবেন? আমরা এক্কা চালিয়ে খাই। সেটা গায়ের জোরে কিনে নিলে খাব কী?"

"আমি আপনার সঙ্গে পরে কথা বলছি," হাতজোড় করলেন সুনীল। বাবলু বেরিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকলেন বছর পঁয়তাল্লিশের প্রদীপ্ত বসু। বেঁটে, মোটা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে রিমলেস চশমা, কাঁধে শান্তিনিকেতনী ঝোলা। চেয়ারে বসেই তিনি বললেন, "আমি সন্দেহভাজনের তালিকায়, কারণ আমি রাইটার। আমার লেখা ঝেড়ে রাজেশদা ছবি বানিয়েছেন।"

"বেশ," বললেন সুনীল। এঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না। নিজেই সব বলবেন।

"বছর পাঁচেক আগে আমার গোলকিপার নিয়ে লেখা একটা ক্রীড়া-উপন্যাস পড়ে রাজেশদা যোগাযোগ করেন। চিত্রস্বত্ব কিনে ছবি বানান, টাকাও দেন। 'গোলকি' ছবিটা বাম্পার হিট করেছিল। গন্ডগোলের শুরু তার পরে। রাজেশদা আমাকে ফিল্মের আইডিয়া দিতে বললেন। আমি একটা করে আইডিয়া ফোনে বলি আর সেটা ঝেড়ে উনি সিনেমা বানান। টাকা দেওয়ার প্রশ্নই নেই, ওপেনিং ক্রেডিটে লেখক হিসেবেও আমার নাম দেন না। সেখানে লেখা থাকে, 'কাহিনি, চিত্রনাট্য, পরিচালনা, প্রযোজনা— রাজেশ'।"

খুক খুক করে হেসে সুনীল বললেন, "এটাই রাগের কারণ?"

"গত পাঁচ বছরে চারটে আইডিয়া ঝেড়ে ফিল্ম বানিয়েছেন। রাগ হবে না?"

"আপনার হাত কাঁপছে কেন?"

খপ করে চেয়ারের হাতল ধরে প্রদীপ্ত বললেন, "কিছু না! মানে... এক্সাইটেড হয়ে গিয়েছিলাম।"

"আপনার গলার আওয়াজ জড়ানো। আপনার কি কোনও মানসিক সমস্যা আছে?"

প্রদীপ্ত অনেক ক্ষণ কাঠের পুতুলের মতো বসে রইলেন। যখন সুনীলের দিকে তাকালেন, চোখ-মুখ লাল। হিস হিস করে বললেন, "হ্যাঁ, আমি মানসিক রুগি। রোজ ওষুধ খেতে হয়। রাইটার হিসেবে ক্রেডিট না পাওয়ার ফ্রাস্ট্রেশন থেকে এটা হয়েছে।"

"অর্থ ও যশ থেকে বঞ্চিত হলে যে আক্রোশ তৈরি হয়, তা সাংঘাতিক। আপনি কখনও রাজেশকে খুন করার কথা ভেবেছেন?"

"রোজ ভাবি! প্রতি মুহূর্তে ভাবি। এখনও ভাবছি," নাক টেনে, হাত চুলকে, ঘাড় বাঁকিয়ে বললেন প্রদীপ্ত।

"কাল রাত আটটা নাগাদ কোথায় ছিলেন?"

"আমি ওই সময়ে গড়ের মাঠেই ছিলাম। সিরিয়াল কিলিং নিয়ে একটা প্লট মাথায় এসেছে। সেই বিষয়ে রিসার্চ করতে ওখানকার হকারদের সঙ্গে কথা বলছিলাম।"

"কাল এই পাজামাটাই পরেছিলেন?"

"হ্যাঁ। কেন?"

"পাজামায় তেলকালি লাগল কী করে?"

"আর বলবেন না। আমার বাইকটার যেখান-সেখান থেকে তেলকালি বেরোচ্ছে।"

"সিরিয়াল কিলিং নিয়ে রিসার্চ করার জন্যেই ওয়ান শটার কিনলেন?"

হো হো করে হেসে প্রদীপ্ত বললেন, "এটা বাজে আন্দাজ! আমার গল্পের গোয়েন্দাও এত কাঁচা জেরা করে না। তবে আপনার সঙ্গে কথা বলে ভাল প্লট পেলাম। মানসিক রোগগ্রস্ত খুনির হাত কাঁপছিল বলে গুলিটা ভিক্টিমের খুলিতে না-লেগে হাতে লেগেছে।"

সুনীল বললেন, "আপনি প্লিজ় নবীনকে পাঠিয়ে দিন।"

{৬}

প্রদীপ্ত বেরিয়ে যেতেই সুনীলের দিকে তাকিয়ে চিনার বললেন, "আমার কাছে ইমেল এসেছে। রুমালে লেগে থাকা কালিঝুলির কেমিক্যাল অ্যানালিসিস কমপ্লিট। ওয়ান শটারের গায়ে লেগে গ্রিজ় আর তেলের সঙ্গে একদম মিলে গেছে। রুমালটা অপরাধীর কাছেই ছিল।"

"হুম!" দরজা দিকে তাকালেন সুনীল। বছর চল্লিশের রোগা, বেঁটে, শ্যামলা এক জন লোক হাত জোড় করে বলছেন, "বাবু, আসব?"

"কে আপনি?" জিজ্ঞেস করলেন সুনীল।

"আমি ওই এক্কার মালিক। নাম ভোম্বল মণ্ডল," মেঝেয় উবু হয়ে বসেছেন ভোম্বল, "একটা কথা ছিল বাবু।"

"আমাদের সঙ্গে?" বিস্ময় প্রকাশ করলেন সুনীল।

"এক্কার লাইনে আর কোনও ফিউচার নেই। তুফানের দানা জোগাতে পরেশান হয়ে যাচ্ছি। আমি তো ভেবেছিলাম ওকে মেরেই দেব। কালকের ঘটনার পরে রাজেশবাবু অনেক টাকা দাম দিচ্ছেন। মুশকিল হল বাবলুর সঙ্গে তুফানের হেবি দোস্তি। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। বাবলু আমাকে সমানে শাসাচ্ছে, তুফানকে যেন বেচে না-দিই। ওকে একটু বকে দেবেন বাবু?"

"আপনি যান," অনুনয় করলেন সুনীল। ভোম্বল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। টি শার্ট আর বারমুডা পরা বছর বাইশের নবীন ঘরে ঢুকে বলল, "নমস্কার!"

নবীন বাবার মতোই ফর্সা, স্মার্ট এবং ভারী কণ্ঠের অধিকারী। তফাত হল, ছেলে লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। বাবার যোগ্য উত্তরসূরি। সে ঢোকা মাত্র বিলিতি আফটার শেভের গন্ধে ঘর ভরে গেল।

"কাল ওই সময় আপনি কোথায় ছিলেন?" কাজের কথা শুরু করেছেন সুনীল।

"আমিই তো মাম্মি-ড্যাডিকে ড্রাইভ করে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওরা হর্স-ড্রন ক্যারেজে উঠল। আমি গাড়িতে 'কে পপ' শুনছিলাম। তখনই মাম্মির ফোন এল।"

"আপনার প্রথম ছবি 'স্টোনম্যান রহস্য' বাম্পার হিট। তার পরে আর ছবি করছেন না কেন?"

"কয়েকটা প্রোজেক্ট পাইপ লাইনে আছে," গোমড়া মুখে বলল নবীন, "অনেক স্ক্রিপ্ট পড়ছি... একটাও পছন্দ হচ্ছে না।"

নবীনের পিঠে হাত রেখে চিনার বললেন, "এটা ফিল্ম ম্যাগাজিনের ইন্টারভিউ নয় নবীন। কেন মিথ্যে বলছিস? তোর হাতে একটাও ছবি নেই।"

চিনারের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত নবীন বলল, "ড্যাডি তোমাকে পাঠিয়েছে, তাই না আঙ্কল? ড্যাডি ভাবছে যে আমি ওকে মার্ডার করতে চাই। লোকটা মানুষ না

শয়তান?”

“প্রথম ছবির সাফল্য তোর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল,” অভিভাবকের মতো বোঝাচ্ছেন চিনার, “নেশা করতে গিয়ে তুই খারাপ লোকের পাল্লায় পড়েছিলি। আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোকদের হাত থেকে ড্যাডিই তোকে বাঁচিয়েছে।”

“ড্যাডি আমাকে বাঁচিয়েছে? রিয়েলি?” হো হো করে হাসে নবীন, “‘অন্ধকারের অশ্বারোহী’ উপন্যাসের হিরোর বয়স বাইশ। নভেলটাকে দুমড়ে মুচড়ে হিরোকে পঞ্চাশ বছরের করা হল, যাতে ড্যাডি হিরোর রোল করতে পারে। পাশাপাশি মাকে বাধ্য করেছে নিজের উপরে ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানাতে। ড্যাডি নিজেকে টলিউডের শেষ সুপারস্টার বলে মনে করে! মাম্মি তাই ঠিক করেছে আমাকে ড্যাডির চেয়েও বড় স্টার বানাবে। তার জন্যে যা যা করা দরকার— সব করবে।”

“ওই জন্যেই প্রদীপ্ত বসু গত কাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে গড়ের মাঠে গিয়েছিলেন?” আন্দাজে ঢিল ছুড়লেন সুনীল। এবং নবীনকে নীরব দেখে বুঝলেন ঢিল ঠিক জায়গায় লেগেছে।

তিনি আর-একটা ঢিল ছুড়লেন। “সিরিয়াল কিলিং নিয়ে নতুন ছবির প্ল্যান চলছে, তাই তো? কাহিনি ও চিত্রনাট্য প্রদীপ্ত বসুর, ফাইনান্স করবেন সাধন সাহা, ডিরেক্ট করবেন পাপিয়া দত্ত আর আপনি হিরো।”

নবীন ঘাড় গোঁজ করে বলল, “হ্যাঁ। ছবির নাম ‘অপারেশান বুনো হাঁস’। এটা একটা স্পাই থ্রিলার।”

“‘স্টোনম্যান রহস্য’ আমি দেখছি। ছবিটায় আপনি হর্স রাইড করেছেন, দু’হাতে ফায়ারিং করেছেন, ভায়োলিন বাজিয়েছেন। এগুলো কি শুটিংয়ের আগে শিখেছিলেন?”

“কাম টু দ্য পয়েন্ট স্যর! আপনি জানতে চাইছেন আমি ফায়ারিং করতে পারি কি না। দ্য আনসার ইজ় ইয়েস! পারি। বাজার থেকে পিস্তল জোগাড় করা আমার বাঁয়ে হাত কা খেল। কলকাতার আন্ডারওয়ার্ল্ডের কাউকে ফোন করলেই হোম ডেলিভারি হবে। কিন্তু কাল আমি কাজটা করিনি। আমি ড্যাডিকে ফিজ়িক্যালি মারতে চাই না। আমি ওকে ফেলিয়োর হিসেবে দেখতে চাই। আই ওয়ান্ট টু সি হিম ফেল অ্যাজ় আ প্রোডিউসার অ্যান্ড অ্যাজ় আ সুপারস্টার। সেটাই হবে আসল মার্ডার।”

নবীন চেয়ার থেকে উঠেছেন। সুনীল জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কোন ব্র্যান্ডের আফটার শেভ ইউজ় করেন?”

“আমার গন্ধ আমার সিগনেচার। তার নাম আপনাকে বলব কেন?” হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন নবীন। সুনীলের হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়েছে। তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, “তাই তো! এগুলো আগে ভাবিনি কেন?”

“কী মনে পড়ল?” চিনার জিজ্ঞেস করলেন।

“বলছি। তবে তার আগে ভোম্বল আর বাবলুর সঙ্গে কথা বলে নিই?” মৃদু হেসে বললেন সুনীল।

{৭}

আরামকেদারায় বসে সেলফি তুলছিলেন রাজেশ। চিনার আর সুনীলকে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, “কাজ কত দূর এগোল?”

“কাজ শেষ,” বললেন সুনীল। তাঁর ইশারায় একে একে ঘরে ঢুকলেন পাপিয়া, সাধন, প্রদীপ্ত আর নবীন। দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে ভোম্বল আর বাবলু।

“তা-ই?” রাজেশ সোজা হয়ে বসেছেন।

“যে কোনও গোয়েন্দা গল্পে এক জন ‘রেড হেরিং’ থাকেন,” মুচকি হাসলেন সুনীল, “রেড হেরিংয়ের বাংলা হল বুনো হাঁস। বুনো হাঁস হল সেই মানুষটা, যাকে গোয়েন্দা সন্দেহ করেন। কিন্তু সে অপরাধী নয়। এটা লেখকের একটা চাল, যাতে পাঠক বুঝতে না-পারেন আসল অপরাধী কে। নবীনের পরের ছবির নাম ‘অপারেশান বুনো হাঁস,’ এটা শোনা মাত্র আমার মাথায় যে সব অসঙ্গতি আর ধন্দ তৈরি হচ্ছিল, সেগুলো জলবৎ তরলং হয়ে গেল।”

“‘অপারেশান বুনো হাঁস’? ছবিটা কে বানাচ্ছে?” নবীনের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকালেন রাজেশ। নিজেকে সামলে সুনীলের দিকে ফিরে বললেন, “বুঝিয়ে বলুন।”

“পাপিয়া দেবী বলেছিলেন, ‘চলন্ত এক্কা তাক করে গুলি চালালে সেটা আমার গায়েও লাগতে পারত।’ কথাটা শুনে তখন কিছু মনে হয়নি। পরে মনে হল চলন্ত এক্কাতে কাউকে গুলি করা খুব রিস্কি। তা ছাড়া আপনি কবে এক্কা চড়বেন তার কোনও ঠিক নেই। এই রকম অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে কেউ খুন করবে কেন? অন্য দিকে, আপনি রোজই ফিল্ম স্টুডিয়ো, ডাবিং স্টুডিয়ো, ফটো শুট বা ইভেন্টে যান। সে সব জায়গায় মারা অনেক সোজা। আপনার তালিকাভুক্ত সন্দেহভাজনরা সে সব জায়গা না বেছে, ছুটন্ত এক্কা কেন বাছলেন?”

“সেটা জানার জন্যেই আপনাকে ডাকা হয়েছে,” রাজেশ বিরক্ত।

“আমার কনফিউশন ক্লিয়ার করতে সাহায্য করেছে নবীনের একটা কথা। ‘আমার গন্ধ আমার সিগনেচার।’ কথাটা শোনা মাত্র মনে পড়ল, যে রুমালটায় ওয়ান শটার মুড়ে গুলি চালানো হয়েছিল, সেটায় জর্দার গন্ধ ছিল। রুমাল নিয়ে গাড়িতে ওঠার ঠিক পরেই গন্ধটা পাই। ভেবেছিলাম ড্রাইভার কালীপদর মুখ থেকে আসছে। কিন্তু তিনি জানান যে পান খাননি। ময়দান থানার বড়বাবুর হাতে রুমাল তুলে দেওয়ার পরে গাড়ি থেকে গন্ধ চলে যায়। গন্ধটা আবার পেয়েছি এই বাড়িতে ঢুকে, এখানকার এক জনের গা থেকে,” দরজার দিকে তাকালেন সুনীল।

বাবলু ঘরে ঢুকে বলল, “ভুল হয়ে গেছে স্যর!” আবারও জর্দার গন্ধে ঘর ভরে গেল।

“একে কে সুপারি দিয়েছিল? পাপিয়া না নবীন? প্রদীপ্ত না সাধন?” জিজ্ঞেস করলেন রাজেশ।

“সেটা বুঝতে আমাকে সাহায্য করে পাপিয়া দেবীর আর একটি কথা। ‘আমি তো মনে করি টার্গেট ছিলাম আমি। এক্কাটা সেই মুহূর্তে ঝাঁকুনি খেয়েছিল বলে বেঁচে যাই।’”

“মানে?”

“আপনি ছাড়াও এই জগতে আরও মানুষ আছে রাজেশবাবু!” শ্লেষের সঙ্গে বললেন সুনীল, “আপনি নিজেই এই গল্পের বুনো হাঁস। আপনি আমাদের ভাবতে বাধ্য করেছেন যে আপনাকে খুনের চেষ্টা হয়েছিল। আমরাও সেটাই ভেবেছি। কিন্তু বাবলু তো আপনাকে চেনেই না! ওর টার্গেট ছিল ওর বাবা! অব্যর্থ মুহূর্তে এক্কায় ঝাঁকুনির কারণে গুলি আপনার হাতে লাগে। এই কথাটা একটু আগে বাবলু ডিসি ডিডি-র সামনে স্বীকার করেছে।”

বাবলু হাত জোড় করে বলল, “এক্কায় ওঠার ব্যাপারে এখন পাবলিকের ইন্টারেস্ট কম। তুফানের খোরাকির খরচ ওঠে না। বাবা তাই তুফানকে মেরে ফেলার প্ল্যান করেছিল। আমার আপত্তি শোনেনি। কিন্তু এ ভাবে কাউকে মেরে ফেলা যায়? আমার ভালবাসার দাম নেই স্যর? সেটাই আমি বাবাকে শেখাতে গিয়েছিলাম। যে, গায়ে গুলি লাগলে, ‘দ্যাখ কেমন লাগে!’ কিন্তু গুলি লাগল বড়বাবুর হাতে। আমাকে মাফ করে দিন বড়বাবু।”

“উনি তোমাকে মাফ করলেও আমরা করছি না,” ইস্পাত কঠিন গলায় বললেন চিনার, “কারণ তুমি এক জন শার্প শুটার। দুটো মার্ডারের হিস্ট্রিও আছে। কালীপদ!”

ডাক শোনা মাত্র ঘরে ঢুকে বাবলুর টি-শার্ট ধরে টান দিলেন কালীপদ। নবীন তাকিয়ে আছেন রাজেশের দিকে। বাবলু ভোম্বলের দিকে।

এক জোড়া পিতা-পুত্রের টানাপড়েনের মধ্যে সুনীল আর চিনার ঘর থেকে বেরোলেন।

গল্প পাঠানোর নিয়মাবলি

- আনন্দমেলায় গল্প পাঠাতে হবে ডাকে কিংবা ইমেলে। পত্রিকা দফতরের রিসেপশনে এসেও গল্প জমা দিতে পারেন।
- ডাকে কিংবা দফতরে জমা দিলে গল্পটি হাতে লিখে কিংবা কম্পিউটারে কম্পোজ় করে প্রিন্ট আউট নিয়েও পাঠাতে পারেন। তবে লেখাটি মনোনীত হলে তখন কিন্তু ইউনিকোডে কম্পোজ় করা সফ্‌ট কপি পাঠাতে হবে। ইমেলে পাঠালে কিন্তু গল্পটিকে প্রথমেই ইউনিকোডে কম্পোজ় করেই পাঠাতে হবে।
- গল্পের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা, মোবাইল/ ফোন নম্বর পাঠানো বাধ্যতামূলক।
- গল্পের শব্দসংখ্যা ২০০০-এর মধ্যে রাখাই ভাল।
- গল্পটি যেন মৌলিক হয়। অন্য কোনও গল্পের অনুবাদ কিংবা অনুসরণ কিংবা অনুকরণ হলেও চলবে না। এবং কোথাও যেন গল্পটি প্রকাশিত না হয়ে থাকে।
- ডাকযোগে গল্প পাঠানোর ঠিকানা: সম্পাদক, আনন্দমেলা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১।
- গল্প পাঠানোর ইমেল হল: anandamela@abpmail.com

ভ্রম সংশোধন: *গত ২০ মে সংখ্যায় ‘গরমের ছুটিতে হাতের কাজ’ প্রচ্ছদকাহিনিতে অরিগ্যামি বিভাগের সিন্ধুঘোটকটি আসলে সি হর্স। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনীয়।*

ছবি: সৌমেন দাস

রহস্যের দাম দু'টাকা

সৈকত মুখোপাধ্যায়

ঠিক অফিস থেকে বেরোনোর মুখেই জয়দেববাবু কল্যাণ বসুর ফোনটা পেলেন। শিয়ালদার কাছে লেবুতলা থানার অফিসার-ইন-চার্জ কল্যাণ বসু। তিনি ফোনেই জিজ্ঞেস করলেন, "ছুটি হয়ে গেছে দাদা? একটু দাঁড়াবেন? আমি এক্ষুনি আসছি।"

বিবাদী বাগের একটা সরকারি দফতরের হেড ক্লার্ক জয়দেব সরকার আর দাপুটে পুলিশ অফিসার কল্যাণ বসুর মধ্যে এমনিতে বন্ধুত্ব তৈরি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু হয়েছে যে, তার কারণ, জটিল রহস্যের প্রতি জয়দেববাবুর আকর্ষণ। শুধু আকর্ষণই নয়, লেবুতলা থানার এ রকম বেশ কিছু জটিল কেসের সমাধানও তিনি করে দিয়েছেন।
আসলে জয়দেব সরকারের নেশা শখের থিয়েটার। অবসর সময়ে তিনি নাটক লেখেন এবং নিজেই পাড়ার ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে-পড়িয়ে সেই নাটক মঞ্চস্থ করান। নাটক নিয়ে সারা ক্ষণ চিন্তা করেন বলেই তিনি মানুষের আচার-আচরণ খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করেন আর সেখান থেকেই তাঁর ওই গোয়েন্দাসুলভ ক্ষমতাটার উৎপত্তি।

কয়েকটা রহস্য উন্মোচনের ঘটনার মধ্যে দিয়েই ওঁদের দু'জনের বন্ধুত্বটা গড়ে উঠেছে।

তা ছাড়া ওদের দু'জনেরই বয়স চল্লিশের কোঠায় আর জয়দেববাবুর বাড়িটাও লেবুতলা থানা থেকে ঢিল-ছোড়া দূরত্বে- সার্পেন্টাইন লেনে। তবে দু'জনেই দু'জনকে 'আপনি-আজ্ঞে' করে কথা বলেন। জয়দেব সরকার বয়সে সামান্য বড় বলে কল্যাণ বসু তাঁকে বলেন, জয়দেবদা।

জয়দেববাবুকে বেশি ক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। অফিসের বাইরে পা দেওয়া মাত্রই পুলিশের বোর্ড লাগানো একটা সাদা গাড়ি সামনে এসে দাঁড়াল। কল্যাণ বসু এবং অন্য এক জন ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে এলেন। যদিও সাদা পোশাকে আছেন, তবু চেহারা দেখলে বোঝা যায় তিনিও পুলিশের লোক।

জয়দেববাবুকে অবাক হতে দেখে কল্যাণ বসু বললেন, "আসলে আমি এসেছিলাম পাশেই, লালবাজারে। আমাদের হেড কোয়ার্টারে। তাই তিলককে বললাম, 'চলো, এক বার জয়দেবদার সঙ্গে এখনই দেখা করে নিই।' অ্যাকচুয়ালি, কেসটা পুরো গুবলেট হয়ে গেছে এবং আমাদের হাতে সময় ভীষণ কম। মেরেকেটে চব্বিশ ঘণ্টা। তার মধ্যে যদি জিনিসটা খুঁজে বের করতে না পারি, তা হলে তিলকের চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে।"

জয়দেববাবুর বুঝতে অসুবিধে হল না, কল্যাণ বসু আজ যে-কোনও কারণেই হোক, খুবই নার্ভাস হয়ে আছেন। এতটাই নার্ভাস যে কথাগুলো অবধি গুছিয়ে বলতে পারছেন না। তিনি ওঁর হাতের উপর আলতো করে নিজের হাতটা রেখে বললেন, "চিন্তা করবেন না স্যার। সব ঠিক হয়ে যাবে। চলুন, একটা কোথাও বসি। উল্টো দিকের ওই রেস্তরাঁটা দেখছি ফাঁকাই আছে। ওখানে বসবেন?"

কল্যাণ বসু তার উত্তরে বললেন, "বসার সময় নেই দাদা। আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। চলুন, গাড়িতে যেতে-যেতে ঘটনাটা বলছি।"

তিনি জয়দেববাবুর জন্যে গাড়ির দরজা খুলে ধরলেন। সবাই গাড়িতে ওঠার পর স্ট্র্যান্ড রোড ধরে হাওড়া স্টেশনের দিকে গাড়ি এগিয়ে চলল।

কল্যাণ বসুর কথা থেকে বোঝা গেল, অন্য যে পুলিশ অফিসারটি ওদের সঙ্গে চলেছেন, তাঁর নাম তিলক সাঁতরা। কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের দুঁদে অফিসার। তিনি কল্যাণ বসুর ব্যাচমেট এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই তিলক সাঁতরার উপরেই দায়িত্ব পড়েছিল, এক জন লোককে 'শ্যাডো' করার, মানে সে বুঝতে না পারে এই ভাবে তাকে অনুসরণ করে যাওয়া এবং প্রয়োজনে তাকে গ্রেফতার করার।

যাকে শ্যাডো করা হচ্ছিল, তাঁর নাম রামপ্রসাদ মাথুর। স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের কাছে পাক্কা খবর ছিল, রামপ্রসাদ মাথুর সল্ট লেকের এক কেন্দ্রীয় গবেষণাগার থেকে একটা অত্যন্ত গোপন ডকুমেন্ট চুরি করে নিয়ে আসছে এবং আজই সে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এজেন্টের হাতে সেই ডকুমেন্ট তুলে দেবে।

রামপ্রসাদ নিজে চোর নয়, সে এক জন ক্যারিয়ার মাত্র। কাজেই শুধু তাকে অ্যারেস্ট করে কোনও লাভ ছিল না। তিলক সাঁতরা তাই প্ল্যান করেছিলেন, রামপ্রসাদ যখন শত্রু রাষ্ট্রের এজেন্টের হাতে ডকুমেন্টটা তুলে দেবে, তখনই এক সঙ্গে দু'জনকে হাতেনাতে পাকড়াও করবেন।

এই অবধি শোনার পর জয়দেববাবু তিলক সাঁতরাকে প্রশ্ন করলেন, "ডকুমেন্টটার চেহারা কেমন? কাগজের বান্ডিল নয় আশা করি।"

"না কাগজ নয়। একটা মেমরি কার্ড, তাঁর মধ্যেই সব তথ্য ভরা আছে। বুড়ো আঙুলের নখের চেয়ে বড় নয়। পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড। তবে যাদের হাতে যাচ্ছে তাদের ওই পাসওয়ার্ড ক্র্যাক করতে দু'মিনিটও লাগবে না।"

"আচ্ছা। তার পর কী হল?"

তিলক সাঁতরা বলে চললেন, "আমরা জানতাম, হাওড়া স্টেশনের কাছেই কোথাও রামপ্রসাদের হাত থেকে ওরা জিনিসটা নেবে। সেই হাতবদলের মুহূর্তটার জন্যেই আমরা অপেক্ষা করছিলাম।"

"আমরা বলছেন কেন? আপনি একাই মাথুরের উপরে নজর রেখে রাখছিলেন না?"

তিলকবাবু বললেন, "সল্ট লেক থেকে আমি একাই ওকে ফলো করে এসেছিলাম বটে। কিন্তু হাওড়া স্টেশনে বাস থেকে নামার পরেই আমার আরও চার জন সহকর্মী, তাঁরাও এসবি-র লোক, আমার সঙ্গে যোগ দেন। বলাই বাহুল্য, আমরা সকলেই ছিলাম প্লেন ড্রেসে এবং সকলের সঙ্গেই অস্ত্র ছিল। সেই জন্যেই বহুবচন ব্যবহার করছি।"

"তার পর?"

তিলকবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কিন্তু এত আয়োজন সবই বৃথা গেল।"

জয়দেববাবু অবাক চোখে তিলক সাঁতরার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বৃথা গেল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বৃথা গেল। স্টেশনের সামনে বাস থেকে নামার পর রামপ্রসাদ দিব্যি শান্ত ভাবে হাওড়া শহরের দিকে হেঁটে চলল। কিছুটা দূরত্ব রেখে আমরা ওকে ফলো করছিলাম। চেহারায়, হাবেভাবে বেটাকে তখন মনে হচ্ছিল ঠিক যেন একটা নিরীহ দেহাতি লোক, যে জীবনে প্রথম বার হাওড়া ব্রিজ দেখছে। মোট কথা, টেনশনের কোনও চিহ্নই ছিল না ওর মধ্যে।

"ডবসন রোড ধরে ও হাঁটছিল। তখন দুপুর একটা। রাস্তাটায় মেছোবাজারের মতো ভিড়। আমি ওর সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনলাম। আমার ভয় ছিল, ওই ভিড়ের সুযোগ নিয়ে পাছে উল্টো দিক থেকে আসা কোনও স্যাঙাতের হাতে ও টুক করে মেমরি কার্ডটা গুঁজে দেয়।"

জয়দেববাবু বললেন, "হ্যাঁ, সেই আশঙ্কা তো ছিলই। তার পর কী হল?"

"কিছুই হল না," খুব হতাশ গলায় বললেন, তিলক সাঁতরা, "কোনও মানুষ তো দূরের কথা, একটা নেড়ি কুকুরও রামপ্রসাদের ধারে-কাছে এল না। সে-ও কোথাও দাঁড়াল না। তবে কিছু ক্ষণ বাদে হঠাৎ এ দিক ও দিক তাকিয়ে রাস্তা ক্রস করল।

"বুঝতেই পারছেন, এটা একটা চালাকি। আসলে ও দেখতে চাইছিল কেউ ওকে ফলো করছে কি না। সেটা বুঝতে পেরে আমি আর রাস্তা পেরোলাম না। একটা গুমটি-দোকানের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম ও উল্টো ফুটপাতে একটা শনি মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করছে... একাই। আশপাশে তখন আর কেউ ছিল না। প্রণাম শেষ করে আবার উল্টো মুখে, মানে হাওড়া স্টেশনের দিকেই হাঁটতে শুরু করল। আমরাও আবার ওকে ফলো করে চললাম। দেখলাম, ও পকেট থেকে ফোন বের করে কাউকে একটা মেসেজ পাঠিয়ে ফোনটা আবার পকেটে রেখে দিল।

"একটু বাদেই আমার নিজের মোবাইল ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠল। চলতে চলতেই কলটা

নিলাম।

"আগে আপনাকে বলা হয়নি, লাকিলি আমরা এক জনকে পেয়েছি, যে ওদের দলেরই লোক, কিন্তু কোনও কারণে ওদের উপরে খেপে আছে। এই ধরনের লোকেরা খুব ভাল ইনফর্মার হয়। একদম ভিতর থেকে অনেক খবর দিতে থাকে। একটাই সমস্যা, আমরা তাকে কোনও নির্দেশ দিতে পারি না। সে নিজের সুবিধে মতো, বিভিন্ন ফোন নাম্বার থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। বলাই বাহুল্য, সব ক'টা নম্বরই ফেক-আইডেন্টিটি দিয়ে বানানো।

"সেই ইনফর্মারই তখন আমাকে ফোন করেছিল। অত্যন্ত রেগেমেগে সে বলল, 'কী করছেন কী আপনারা? জিনিস তো ডেলিভারি হয়ে গেল। রামপ্রসাদ এই মাত্র বসের কাছে মেসেজ পাঠিয়ে সে-কথা জানিয়েছে।'

"'জিনিস ডেলিভারি হয়ে গেল!' বাজ পড়ল আমার মাথায়।

"বুঝলাম আর গোপনীয়তার দরকার নেই। আমার সঙ্গীদের ডেকে নিলাম।

তার পর দু'মিনিটের মধ্যে মাথুরকে পুলিশ ভ্যানে তুলে নিয়ে চলে এলাম একেবারে লালবাজারে।"

জয়দেববাবুর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, উনি মন দিয়ে প্রতিটি কথা শুনছিলেন। এ বার বললেন, "মাথুরের বডি তো নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে সার্চ করে ফেলেছেন। মেমরি কার্ড পাননি?"

তিলক সাঁতরা ঘাড় নাড়লেন।

"এমন কিছু পেয়েছেন যেটা আনইউজুয়াল?"

তিলক সাঁতরা কিছু ক্ষণ ভেবে বললেন, "না, যখন সার্চ করেছিলাম তখন কিছু পাইনি। তবে সল্ট লেকের ওই ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়েই ও দুটো জিনিস পকেট থেকে বের করে রাস্তার ধারে ছুড়ে ফেলেছিল। জায়গাটা পেরিয়ে যাওয়ার সময় আমিও এক বার জিনিস দুটো দেখেছিলাম। তেমন সিগনিফিক্যান্ট কিছু নয়।"

জয়দেব সরকার বললেন, "তবুও শুনি, কী।"

"একটা পাঁচ টাকা দামের অ্যাডহেসিভের টিউব। যেগুলো এক বার ইউজ় করে ফেলে দেওয়া যায়। আর একটা সিঁদুরের প্যাকেট।"

জয়দেববাবু কিছু ক্ষণ ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবলেন। তার পর বললেন, "মাথুরকে জেরা করেছেন? কী বলছে?"

"কিচ্ছু বলেনি। ব্যাটা পায়ে টায়ারের চপ্পল আর গলায় গামছা পেঁচিয়ে ঘুরে বেড়ালে কী হবে, আসলে অতি ঘুঘু লোক। জানে ওর বিরুদ্ধে আমাদের কোনও প্রমাণ নেই। গ্রেফতার করতে পারব না, এমনকি মোবাইলটাও বাজেয়াপ্ত করতে পারব না। কাজেই ঠোঁটে কুলুপ দিয়ে বসে আছে। কিছু জিজ্ঞেস করলে বলছে গঙ্গা দেখতে এসেছিলাম।"

"মেসেজটা কাকে পাঠিয়েছিল দেখেছেন?"

"চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দেখতে পাইনি। সঙ্গে সঙ্গে ডিলিট করে দিয়েছে। সাইবার ক্রাইম সেলকে বলেছি, খোঁজ নিতে। কিন্তু ওরা তো চব্বিশ ঘণ্টার আগে কিছু বলতে পারবে না। আর বললেই বা কী হবে? এই সব ভাড়াটে ক্যারিয়ারদের কাছে কিং-পিনের ফোন নম্বর থাকে না।

যার কাছে মেমরি কার্ডটা পৌঁছে গেল, তার কাছে নিশ্চয়ই থাকত। কিন্তু তাকে তো পেলাম না।

"এখন আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন স্যর? লোক হাসিয়েছি। সিম্পলি লোক হাসিয়েছি। এর চেয়ে সল্ট লেকের ওই ইনস্টিটিউট থেকে বেরোনো মাত্রই যদি মাথুরকে অ্যারেস্ট করতাম, তা হলে ডকুমেন্টটা অন্তত পেয়ে যেতাম। তার ভিত্তিতে ওকে কাস্টডিতে নিয়ে কথা বের করার চেষ্টা করতে পারতাম।"

জয়দেববাবু বললেন, "আপনাদের সেই ইনফর্মার, সে আর কিছু বলতে পারছে না?"

"না। ওরা ছোটমোটো লোক। দূর থেকে যেটুকু শোনে, তা-ই বলে। প্রাণের ভয় তো ওদেরও থাকে। তা ছাড়া, শেষ বার যখন ফোন করেছিল তখনই ও বলেছিল, লিডাররা বেরিয়ে যাচ্ছে, জায়গা পাল্টাচ্ছে। তাই ওর পক্ষে আর কোনও খবর দেওয়া সম্ভব হবে না।"

"বুঝলাম," একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জয়দেববাবু কল্যাণ বসুকে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি স্যর?"

কল্যাণ বসু বললেন, "তিলক আপনাকে রাস্তার যে স্ট্রেচটুকুর কথা বলল, মানে, যে রাস্তাটা ধরে রামপ্রসাদ হেঁটেছিল, আপনিও এক বার সেই স্ট্রেচটুকু দেখুন জয়দেবদা। যদি এমন কিছু আপনার চোখে পড়ে, যার থেকে মেমরি কার্ডটার হদিস পান। মাথুর জিনিসটাকে সিম্পলি রাস্তায় ফেলে দিয়ে তো চলে আসতে পারে না! বিশেষ করে ওই রকম ভিড়ে-ঠাসা রাস্তায়, যেখানে মুহূর্তের মধ্যে পায়ের ঠেলায় ওটা হারিয়ে যাবে।"

তিলক সাঁতরা বললেন, "ঠিকই। ফেলে দেয়নি। ওর নিজের কাছেও নেই। তার মানে ওটা ও সত্যিই এজেন্টের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু কী ভাবে? আপনি একটু দেখুন স্যর। কল্যাণের কাছে শুনেছি, আপনি প্রখর অনুমানশক্তির উপরে নির্ভর করে অনেক রহস্যের সমাধান করেছেন। এ বারটাও আমাকে বাঁচান।"

গাড়িটা রবীন্দ্র সেতু পার হয়ে সোজা কিছুটা গিয়ে বাঁ দিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেল। কল্যাণ বসু বললেন, "চলুন জয়দেবদা।"

জয়দেব সরকার গাড়ির দরজা খুলে নামতে নামতে বললেন, "আমি কিন্তু একাই যাব। আপনারা সঙ্গে থাকলে অনেকের নজরে পড়ে যাব, সেটা চাইছি না। চিন্তা করবেন না, এ-রাস্তা আমার চেনা।"

বাঁ দিকের ফুটপাত ধরে ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছিলেন জয়দেব সরকার আর ভাবছিলেন, 'আচ্ছা, কারও কাছে কোনও জিনিস পৌঁছে দিতে গেলে কি জিনিসটা তার হাতেই দিতে হয়? সকালের খবরের কাগজটা কি কাগজওয়ালা আমার হাতে ধরিয়ে দেয়? দেয় না তো? সে গ্রিল গলিয়ে বারান্দায় ফেলে দেয়, আমি আমার সময় মতো তুলে নিই।

'এরা যদি সেই একই কায়দায় কাজটা করে থাকে? যদি এই রাস্তার মধ্যেই মাথুর কোথাও মেমরি কার্ডটা নামিয়ে রেখে চলে যায়, মেসেজ পাঠায় 'ডেলিভার্ড', আর তার পরে পুলিশ-টুলিশ চলে গেলে ওদের এজেন্ট কার্ডটাকে সেই জায়গা থেকে তুলে নিয়ে চলে যায়?

'এই সহজ সম্ভাবনাটার কথা কল্যাণ বসু কিংবা তিলকবাবুর মাথায় আসছে না কেন?'

তার পর নিজেই উত্তর দিলেন, 'আসছে না তার কারণ, ডবসন রোডের এই অংশটুকুর মধ্যে ও রকম একটা নখের সাইজের মেমরি কার্ড নামিয়ে রেখে যাওয়ার মতো কোনও জায়গা নেই।'

এই সব ভাবতে ভাবতে তিনি পৌঁছে গেলেন সেই জায়গাটায়, যেখান থেকে উল্টো দিকের ফুটপাতের শনি মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে। মন্দিরের সামনে লোকজন তেমন নেই। এক জন, দু'জন আসছে, নমস্কার করছে, চলে যাচ্ছে। এক ভদ্রলোক প্রণাম করার পর পকেট থেকে পয়সা বের করে দিলেন।

দৃশ্যটা দেখেই জয়দেব সরকার চমকে উঠলেন। প্রণামীর থালা। এই পুরো রাস্তাটার মধ্যে ওই একটা জায়গা তো রয়েছে, যেখানে কাউকে না-জানিয়ে ওরা মেমরি কার্ডটা রেখে যেতে পারে।

কিন্তু... নিজেকেই তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কয়েন আর নোটের মধ্যে একটা উজ্জ্বল রঙের চৌকোনা মেমরি কার্ড পড়ে রয়েছে- এই দৃশ্য সবার চোখ টানবে না?

'অবশ্যই টানবে, যদি না মেমরি কার্ডটাকেও কয়েনের পোশাক পরানো হয়।

'ইয়েস,' জয়দেব সরকার মনে-মনে নিজেই নিজেকে ভিকট্রি সাইন দেখালেন। ইয়েস! এই ভাবেই ওরা পুরো কাজটা করেছিল।

তিনি মনশ্চক্ষে দেখতে পেলেন, ইনস্টিটিউট থেকে বেরোনোর আগেই মাথুর দুটো সাধারণ কয়েনের মাঝখানে মেমরি কার্ডটাকে রেখে, কয়েন দুটোকে আঠা দিয়ে জুড়ে দিল। এক দিকে রইল একটা কয়েনের হেড আর অন্য দিকে রইল অন্য কয়েনটার টেল। ব্যস, সব মিলিয়ে দেখতে হল একটাই কয়েনের মতো, শুধু মাঝখানে লুকিয়ে রইল পাতলা একটা চিপ।

তার পর মাথুর চট করে সেই জাল কয়েনটার গায়ে একটু সিঁদুর মাখিয়ে দিল। না হলে ওর দলের লোকেরা প্রণামীর থালায় অত কয়েনের মধ্যে থেকে ঠিক কয়েনটাকে চট করে চিনে নিতে পারবে না।

এবং ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়ে ও আঠার টিউব আর সিঁদুরের প্যাকেটটাকে ফেলে দিল রাস্তায়।

'কোনও ভুল নেই। এটাই ঘটেছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সেই জাল কয়েন কি এখনও প্রণামীর থালায় পড়ে আছে? আশা কম। নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গেই ওর গ্যাংয়ের লোকেরা ওটাকে তুলে নিয়ে গেছে।

‘তবু এক বার দেখা যাক,’ এই ভেবে জয়দেব সরকার রাস্তা পেরিয়ে শনি মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং যা দেখলেন, তাতে চমকে উঠলেন। মন্দিরে প্রণামীর থালা নেই। স্টেনলেস স্টিলে গড়া শক্তপোক্ত একটা দানপাত্র রয়েছে, তাও আবার চেন-তালা দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। ভিতর থেকে দু'জন পুরোহিত এ দিকে নজর রাখছেন।

ওই বাক্সে জাল কয়েন ফেললেও ওদের লাভ হত না। তাকে উদ্ধার করতে গেলে রীতিমতো ডাকাতি করতে হত। ওরা আর যা-ই করুক, লোক জানাজানি করতে চাইবে না। তার মানে, সবটাই আবার নতুন করে ভাবতে হবে।

হতাশ হয়ে ফেরার পথে পা বাড়িয়েছিলেন জয়দেব সরকার, কিন্তু হঠাৎ একটা হালকা হাত তাঁর পা ছুঁল। কে যেন বলল, “বাবু, কিছু দিয়ে যান।”

তিনি চমকে পায়ের দিকে তাকালেন। দেখলেন, একটা বারো-তেরো বছরের ভিখিরি ছেলে বসে আছে। ছেলেটা দৃষ্টিহীন। মুখ তুলে তাকিয়ে আছে বলেই উনি দেখতে পাচ্ছিলেন, ওর দুটো চোখেই মণির জায়গাটা বিলকুল সাদা।

জয়দেববাবুর স্নায়ুগুলো আবার টান টান হয়ে উঠল। ‘প্রণামীর বাক্সে নয়, মাথুর জাল কয়েনটাকে নিশ্চয়ই এই অন্ধ ছেলেটার ভিক্ষের বাটিতেই ফেলে দিয়ে গেছিল। কাজটা খুবই সহজ। ছেলেটা বসে আছে একেবারে ঠাকুরের সামনে যে বেড়া, তার গা ঘেঁষে। প্রণাম সেরে হাতটা কপাল থেকে নামানোর সময়ই যদি মাথুর টুক করে ওর বাটিতে একটা কয়েন ফেলে দেয়, তা হলে উল্টো দিকের ফুটপাত থেকে তিলক সাঁতরার পক্ষে সেই সূক্ষ্ম হাতের কাজটুকু দেখতে পাওয়া অসম্ভব।

‘তা ছাড়া ভেবে দেখলে, কয়েনটা রেখে যাওয়ার পক্ষে ওই অন্ধের ভিক্ষের বাটিটার চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর কিছু নেই। প্রণামীর থালা তো তবু সবার চোখের সামনে থাকত। ওর ভিক্ষের বাটিটা তো ও ছাড়া আর কেউ দেখছে না। এমনকি ও নিজেও দেখছে না, যেহেতু ওর চোখ নেই।’

তিনি হাঁটু মুড়ে ভিখিরি ছেলেটার সামনে বসে পড়লেন। নরম গলায় জানতে চাইলেন, “নাম কী বাবা তোমার?”

“কানু।”

“কখন থেকে এখানে বসে আছ? রোজই বসো?”

“হ্যাঁ, রোজই বসি। সকাল আটটা থেকে সন্ধে আটটা।”

জয়দেববাবু দেখলেন, ছেলেটা দু'হাতে ওর ভিক্ষের বাটিটা আগলে রেখেছে। ভয় পাচ্ছে, যদি কেড়ে নেয়। তিনি বললেন, “ভিক্ষে তোমাকে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে আমার একটা উপকার করো। আমার খুব খুচরো পয়সার দরকার। তোমার থালায় যত কয়েন আছে, আমাকে দিয়ে দাও। আমি তার বদলে তোমাকে নোট দিচ্ছি।”

শুনেই কানু “এই রে,” বলে জিভ কাটল। বলল, “অন্য দিন কত খুচরো থাকে আমার কাছে। আর দেখুন, আজকেই একটা লোক এসে সব কয়েন নিয়ে চলে গেল।”

এ রকমই একটা কিছু আন্দাজ করেছিলেন জয়দেব সরকার। কেনই বা ওরা এত ক্ষণ মেমরি কার্ডটাকে এখানে পড়ে থাকতে দেবে? তবু তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “কত ক্ষণ আগে?”

“দুপুর দেড়টা নাগাদ, স্যর। তার পর আর বেশি ভিক্ষে পাইনি।”

“কে নিয়ে গেল? জানো কিছু?”

“তা তো বলতে পারব না। তবে হিন্দিতে কথা বলছিল। মনে হল বেশ বড়লোক। গা দিয়ে সেন্টের গন্ধ ছাড়ছিল। আমি বললাম, ‘একটু দাঁড়ান, বাবু। গুনে দেখি কত টাকা আছে।’ তিনি বললেন, ‘কোনও দরকার নেই। তিনশো টাকা রাখ,’ এই বলে আমার হাতে তিনটে একশো টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে, থালায় যত কয়েন ছিল সব একটা প্যাকেটের মধ্যে ঢেলে নিয়ে চলে গেলেন।”

সব শুনে জয়দেববাবু কানুর পিঠে একটা চাপড় মেরে উঠে দাঁড়ালেন। যাওয়ার আগে পার্স খুলে যে ক'টা পয়সা ছিল, ঢেলে দিয়ে গেলেন ওর অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে।
হাঁটতে হাঁটতে তিনি ভাবছিলেন, ‘মেমরি কার্ডটা তিলকবাবুকে ফিরিয়ে দিতে পারব না। তবে ওটা কী ভাবে হাওয়া হয়ে গেল, তার একটা হদিস দিতে পারব ঠিকই।’

এই সব ভাবতে ভাবতে যখন তিনি পুলিশের গাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন, তখনই দেখলেন, উল্টো দিক থেকে কল্যাণ বসু আর তিলক সাঁতরা হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছেন। ওঁকে দেখতে

পেয়ে দু'জনেই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

কল্যাণ বসু বললেন, "একটা কাণ্ড ঘটেছে জয়দেবদা। আমাদের যে ইনফর্মার, সে এই মাত্র তিলককে ফোন করে জানাল, ওদের বসেরা নাকি রেগে তুলকালাম করছে।

মেমরি কার্ডটা যেখানে পাওয়ার কথা সেখানে ওরা পায়নি। তিলক জিজ্ঞেস করেছিল, 'জায়গাটা কোথায়,' তার উত্তরে 'জানি না' বলে ফোন কেটে দিল।"

জয়দেব সরকার এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিজের মনেই বললেন, "পায়নি! কেন পায়নি? কানু তো বলল, ওরা সব পয়সাই নিয়ে গেছে।"

পর মুহূর্তেই তাঁর মুখটা রাগে বিকৃত হয়ে গেল। নিজের উপরে রাগ। মাটির উপরে পা দিয়ে আঘাত করে বললেন, "এত স্টুপিড আমি কেমন করে হলাম? আমি কি অন্ধদের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিনি? নাটক করতে গিয়ে কত বার ব্লাইন্ড স্কুলের ছেলেমেয়েদের পাশে বসে থেকেছি। কত গল্প করেছি ওদের সঙ্গে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!"

কল্যাণ বসু অবাক হয়ে ওঁর হাতটা চেপে ধরলেন। বললেন, "জয়দেবদা, কী হল আপনার? কী বলছেন, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।"

হঠাৎ যেন বাস্তব জগতে ফিরে এলেন জয়দেব সরকার। সতর্ক ভঙ্গিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনাদের সঙ্গে আর্মস আছে তো? চলুন। একটা বাচ্চার খুব বিপদ। ওকে বাঁচাতে পারলে, আপনারা যা খুঁজছেন, পেয়ে যাবেন।"

জয়দেব সরকার যে বিপদের কথা আন্দাজ করেছিলেন, সেটা আশ্চর্যজনক ভাবে মিলে গেল। গাড়ি নিয়ে ওই শনি মন্দিরের কাছাকাছি ফিরে যেতে ওঁদের পাঁচ-মিনিটও লাগেনি। গাড়ির ড্যাশবোর্ডের ঘড়িতে তখন সময় দেখাচ্ছে রাত আটটা পনেরো। হঠাৎই জায়গাটা অসম্ভব নির্জন হয়ে গেছে। নিভে গেছে শনি মন্দিরের আলোও।

অন্ধ ভিক্ষুক কানু তার কাঁধের ঝোলা সামলে, হাতের লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে রাস্তা পেরিয়ে রাতের আশ্রয়ের দিকে চলেছিল। হঠাৎই উল্টো দিক থেকে একটা সাদা এসইউভি এসে কর্কশ শব্দে ব্রেক কষে ওর পাশে দাঁড়িয়ে গেল আর গাড়ির দরজা খুলে একটা লোক নেমে এসে কানুর ঘাড়ে একটা জোরালো ধাক্কা দিয়ে ওকে মাটির উপরে ফেলে দিল।

কিন্তু লোকটা যখন মাটির দিকে ঝুঁকে কানুর কাঁধ থেকে খসে পড়া ঝোলাটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, তখনই তিলক সাঁতরার রিভলভারের নল তার ঘাড়ের পিছনে সেঁটে গেল। ও দিকে কল্যাণ বসু তত ক্ষণে গাড়ির সামনের জানলা দিয়ে হাত গলিয়ে তার বন্দুকের নলটা ঠেকিয়ে ধরেছেন ড্রাইভারের চোয়ালের নীচে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাওড়া ফাঁড়ি থেকে পাঁচ-সাত জনের একটা ব্যাকআপ টিম এসে গাড়ি সমেত দুই দুষ্কৃতীকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে চলে গেল। আসার পথেই তিলক সাঁতরা ওদের সে রকম ইনস্ট্রাকশন দিয়ে এসেছিলেন।

জয়দেববাবু ইতিমধ্যে কানুকে পাঁজাকোলা করে তুলে, শনি মন্দিরেরই সামনের সিমেন্টের বেঞ্চিটায় শুইয়ে, ওর হাত-পায়ের ধুলো-কাদা ধুয়ে দিয়েছেন। দেখে নিয়েছেন, ওর শরীরে কোথাও আঘাত লাগেনি। তবে ভয় পেয়েছে খুব।

উনি ডাকলেন, "কানু! ভয় নেই। আমরা আছি। পুলিশের লোকেরা রয়েছেন।"

চেনা গলার আওয়াজ পেয়ে উঠে বসল কানু। দৃষ্টিহীন চোখ দুটো আকাশের দিকে তুলে বলল, "একটু আগে আপনিই শনি মন্দিরে এসেছিলেন না? নোট ভাঙাতে চাইছিলেন।"

জয়দেববাবু বললেন, "হ্যাঁ। একটা জিনিস তখন জিজ্ঞেস করার কথা মাথায় আসেনি। আচ্ছা কানু, ওই লোকটা তোমার কাছ থেকে টাকা ভাঙিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগেই কি তুমি তোমার থালা থেকে একটা কয়েন ফেলে দিয়েছিলে?"

কানু অবাক গলায় প্রশ্ন করল, "আপনি কেমন করে জানলেন?"

"বলো না। ফেলে দিয়েছিলে?"

কানু ঘাড় নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ।

ছুঁয়েই বুঝেছিলাম জাল টাকা। একটু বেশি ভারী, একটু বেশি পুরু। তাই ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম।"

“কোথায় ফেলেছিলে?” জিজ্ঞেস করলেন জয়দেব সরকার।

“ওই তো, যেখানে বসি, তার ঠিক পিছনেই,” তার পর একটু ভেবে বলল, “ছুড়ে ফেলার পরেও কোনও শব্দ পাইনি। তার মানে বাসি ফুল আর শালপাতার স্তূপের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল কয়েনটা।”

কল্যাণ বসু এবং তিলক সাঁতরা পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। তাঁদের আর কিছু বলতে হল না। মুহূর্তের মধ্যে চার সেলের টর্চের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল সেই বাসি ফুল আর শুকনো পাতার স্তূপ। উপর থেকে অল্প কিছু ফুল সরাতেই বেরিয়ে এল একটা সিঁদুর-মাখানো এক টাকার কয়েন, যেটাকে দেখতে যতটা সাধারণ, আসলে ততটা সাধারণ নয়। কারণ, ওটাকে গাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে যখন একটা ছুরি দিয়ে মাঝখানে চাড় দেওয়া হল, তখন বাদামের খোলার মতো দুটো কয়েন দু'দিকে খুলে পড়ে গেল আর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা মেমরি কার্ড।

সেটা হাতে নিয়ে তিলক সাঁতরা জয়দেব সরকারের দিকে তাকালেন। বললেন, “আপনি তো ম্যাজিশিয়ান জয়দেবদা। নিজেকে শুধুমুধু গালাগাল করছিলেন কেন?”

জয়দেব সরকার লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, “করব না? ভিক্ষের বাটিতে একটা কারচুপি করা কয়েন পড়লে আমরা, যাদের চোখের দৃষ্টি আছে, তারা না-ও বুঝতে পারি। কিন্তু যে অন্ধ, সে তো শব্দ শুনেই সেটাকে চিনে নেবে। হাত দিয়ে ছুঁয়েই বুঝে যাবে ওটা জাল। এই সহজ কথাটা কেন আমার মাথায় আসেনি? যদি আসত, তা হলে কানুকে কখনওই একা রেখে যেতাম না।”

কল্যাণ বসু বললেন, “ভাগ্যিস কানু বুঝেছিল। তাই তো আমাদের সম্মান বাঁচল। ওকে আর এ ভাবে ভিক্ষে করতে দেওয়া যায় না, তাই না তিলক? জয়দেবদা, কী বলেন?”

তিলক সাঁতরা আর জয়দেব সরকার সমস্বরে বললেন, “অবশ্যই।”

ক্লু
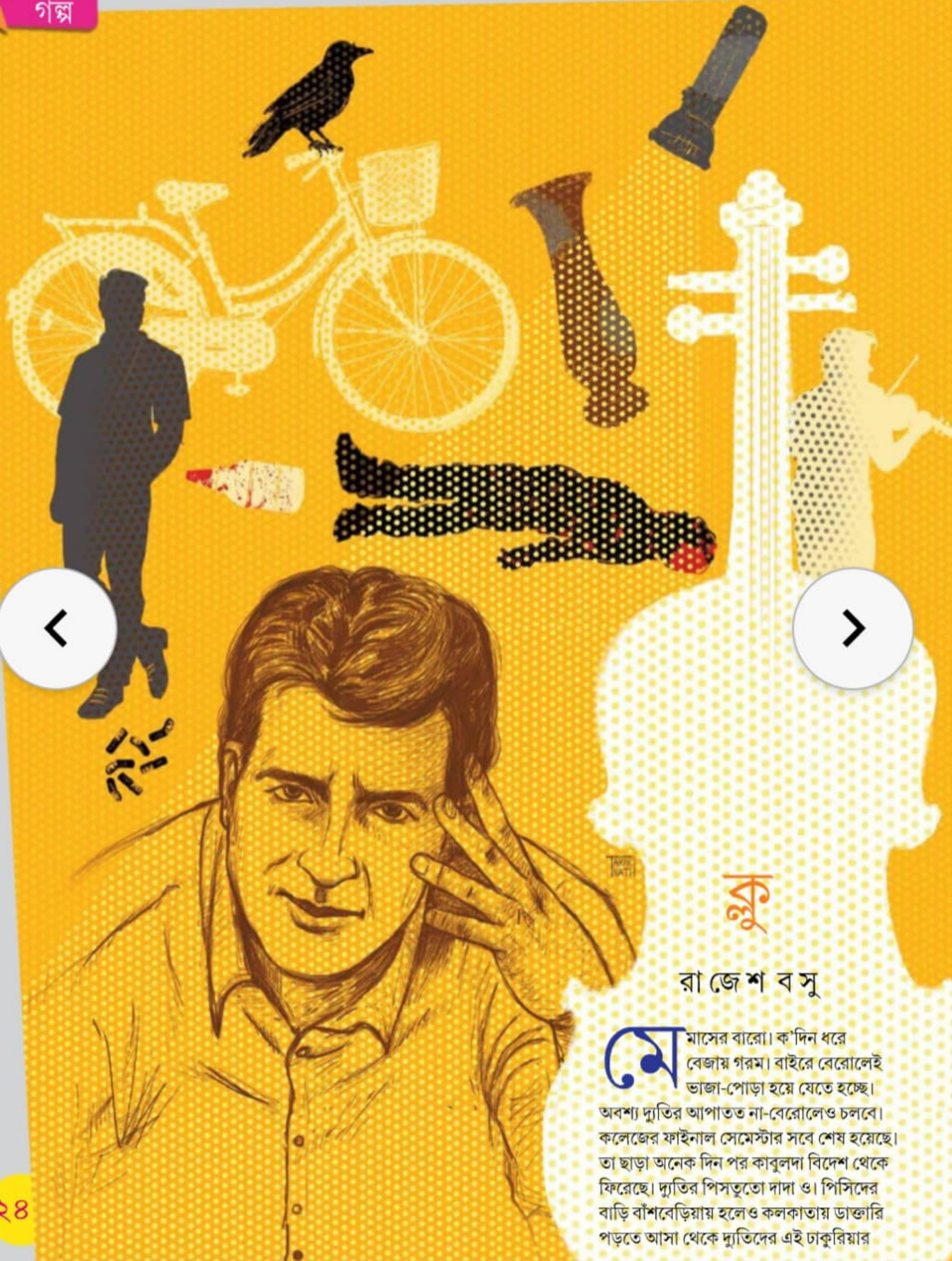
রাজেশ বসু

মে মাসের বারো। ক'দিন ধরে বেজায় গরম। বাইরে বেরোলেই ভাজা-পোড়া হয়ে যেতে হচ্ছে। অবশ্য দ্যুতির আপাতত না-বেরোলেও চলবে। কলেজের ফাইনাল সেমেস্টার সবে শেষ হয়েছে। তা ছাড়া অনেক দিন পর কাবুলদা বিদেশ থেকে ফিরেছে। দ্যুতির পিসতুতো দাদা ও। পিসিদের বাড়ি বাঁশবেড়িয়ায় হলেও কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে আসা থেকে দ্যুতিদের এই ঢাকুরিয়ার

বাড়িতে থাকত। তখন কত ছোট দ্যুতি, স্কুলের গণ্ডিই পেরোয়নি। ওর চেয়ে বছর দশেকের বড়ও কাবুলদা। তবুও দু'জনে মিলে বন্ধুত্ব হয়েছিল খুব। আসলে দ্যুতির মতো কাবুলদাও ছিল গোয়েন্দা গল্পের পোকা। শুধু পোকাই না, দু'জনে মিলে কয়েকটা জটিল রহস্যের কিনারাও করে ফেলেছিল ওরা। কাবুলদা প্রবাসী হওয়ায় গোয়েন্দা হওয়ার শখেও দাঁড়ি পড়ে। সে বিষয়েই বিকেলে গল্প হচ্ছিল।

এমন সময় দ্যুতির বাবার বন্ধু বসাককাকু এসে হাজির। লেক থানার চার্জে রয়েছেন কাকু। কাবুলদাকে দেখে উনিও বসে গেলেন আড্ডায়।

কথায় কথায় বললেন, "পুলিশের কাছে কত রকম কেসই না আসে। একটা কেস এসেছে বিদেশি বেহালা চুরি হওয়ার। দশ লাখ টাকা বিমা করা রয়েছে সেটার। মালিক রজার গোমস নামে একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলে। যোধপুর পার্কে 'ক্যাফে মিউজ়িকা' নামে একটা রেস্তরাঁ আছে। সেখানে রোজ সন্ধেয় ভায়োলিন বাজায় ছোকরা। বছর পঁচিশ বয়স। তার দাদা আছে স্যামুয়েল। সে রেস্তরাঁর কফি-ব্রিউয়ার, বা বরিস্তাও বলতে পারো। আবার কুকও। দুলাল সামন্ত নামে এক রিটায়ার্ড সিভিল ইঞ্জিনিয়ার রেস্তরাঁটার মালিক। আসলে ওটা তার নিজের বাড়িরই গ্রাউন্ড ফ্লোরে। তিন তলা বাড়ি। রজাররাও ওই বাড়িতেই থাকে। তেতলার দু'টি ঘর দিয়েছেন ওদের দুলালবাবু। উনি নিজেও থাকেন এক তলায়। ভদ্রলোক অকৃতদার। একলাই থাকেন। তবে রেস্তরাঁটি ছাড়া বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ মোটেই সুবিধের না। দোতলাটা পুরো ফাঁকা, কেউ থাকে না। সোমবার রেস্তরাঁ বন্ধ থাকে। সে দিন দুই ভাইয়ে নিউটাউনে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল। এসে দেখে ফ্ল্যাটের দরজার তালা ভাঙা। ঘরের জিনিসপত্র সব ঠিক আছে, তিনটি বেহালার মধ্যে ওইটিই উধাও। এক জন সাব-ইনস্পেক্টরকে পাঠাই বিষয়টা দেখতে। উঠে আসে নতুন তথ্য। দক্ষিণ-কোরিয়ার কলকাতা দূতাবাসের এক জন কর্তা রজারের বাজনায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁদের দেশের একটি নামী প্রতিষ্ঠানে বাজানোর প্রস্তাব দিয়েছেন কিছু দিন হল। লোভনীয় বেতন, থাকাও নিখরচায়। স্যামুয়েলের জন্যেও নামী হোটেলে কাজের ব্যবস্থা। বাগড়া দিচ্ছেন দুলাল সামন্ত। রজারদের ছাড়বেন না উনি। ওদের সঙ্গে রীতিমতো চুক্তিও রয়েছে তাঁর। আরও দু'বছর তারা ক্যাফে মিউজ়িকায় কাজ করবে। চুক্তিভঙ্গে অনেক টাকার অর্থদণ্ড। বুঝতে পারছ তো কেসটা কী দাঁড়াচ্ছে?"

"মানে থেফ্‌টের গল্প ফেঁদে বিমার টাকায় দুলালবাবুর চুক্তিভঙ্গের টাকা মেটাতে চাইছে ওরা। কিন্তু টাকা পেতে হলে পুলিশ রিপোর্টও জরুরি। বিমা কোম্পানি নিজেরাও তদন্ত করে," বলল কাবুলদা।

"সে তো বটেই। সময় নিচ্ছি তাই। আমার ধারণা বেহালাটা নিজেরাই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।

সব ঝামেলা মিটলে বগলদাবা করে বিদেশে কেটে পড়বে। বাড়িতে এক জন রক্ষীও আছে, সে-ও কিছু আঁচ পেল না? আমাদের তরফে খুঁজেও দেখা হয়েছে গোটা বাড়ি। তোমরা গিয়ে দেখে আসতে পারো। বিকেল তিনটে থেকে ক্যাফে চালু হলেও রজার অবশ্য বাজায় ছ'টার পর।"

কাবুলদা বলল, পরে এক দিন যাবে। দ্যুতি অবশ্য রেস্তরাঁটার নাম শুনেছে। যায়নি কখনও।

ঘটনা ঘটল সোমবার, পনেরো তারিখ। সকাল এগারোটা নাগাদ বসাককাকু কাবুলদাকে ফোন করে বললেন, "ক্যাফে মিউজিকায় সাংঘাতিক কাণ্ড! দুলাল সামন্ত খুন হয়েছেন। বডি ময়নাতদন্তে চলে গেছে। ফরেন্সিকের কাজও মোটামুটি শেষ। তোমরা চাইলে আসতে পারো।"

হেঁটেই দশ-বারো মিনিটে পৌঁছে গেল ওরা। একটা নামী লেদার বিপণির পিছনের রাস্তায় ক্যাফে মিউজিকা। বাড়ির অবস্থা যেমনই হোক, রেস্তরাঁর বাইরেটা বেশ জমকালোই। এক জন সহকর্মীর সঙ্গে বসাককাকু বাইরেই অপেক্ষা করছিলেন। বাড়ির সামনের অংশে রেস্তরাঁ। দ্যুতিরা ঢুকল পাশ দিয়ে। সরু গলি। ছ'ফুট মতো পাঁচিল দেওয়া। পাঁচিলের মাথায় সারি সারি লোহার ফলা বসানো। কিছুটা গিয়ে সিঁড়ির দরজা। একটা লেডিজ় সাইকেল হেলান দিয়ে রাখা পাঁচিলে। ও পাশে দোতলা বাড়ি। তবে এ বাড়ির মতো পুরনো না। এ বাড়ির এক তলাটাই পাশের বাড়ির দোতলার মতো উঁচু। কুকুরও আছে মনে হয়, ডেকে উঠছে মাঝে মাঝে।

যা-ই হোক, ভিতরে ঢুকলে সামনে পিছনে দু'দিকে দুটো ফ্ল্যাট। সামনেরটা রেস্তরাঁ। পিছনেরটায় দুলালবাবু থাকতেন।

বসাককাকু বললেন, "ক্রাইম রাত এগারোটা থেকে একটার মধ্যে। ওই রজার ছোকরাই কালপ্রিট। ক্লু জোগাড় করছি, ঠিক সময়ে অ্যারেস্ট করব। ছোকরা অবশ্য বেশি চালাক, বলছে অনেক রাত্তিরে কেউ নাকি বাড়ির নীচে টর্চ নিয়ে ঘুরছিল। গলা খাঁকারি দিতে কেটে পড়ে। বিভ্রান্ত করার চেষ্টা আর কী।"

"বডি আবিষ্কার করে কে?" জিজ্ঞেস করল কাবুলদা।

"পারুল হালদার। দুলালবাবুর ঠিকে কাজের লোক। সকাল কাজে এসে সে-ই দেখে প্রথম। এক জন সিকিয়োরিটি গার্ডও রেখেছিলেন দুলালবাবু। দোতলার বারান্দাটা তাকে দেওয়া হয়েছিল মাঝে-মধ্যে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে। সে ব্যাটা সেখানে ঘুমিয়েই কাটায়। পারুলই ডেকে তোলে তাকে। এক জন ম্যানেজারও আছে রেস্তরাঁটার জন্য। মনোজ বর্মণ। সে-ও আছে এখানে। জিজ্ঞাসাবাদ এক দফা হয়েছে। তুমি চাইলে কথা বলতে পারো। ডাকব এক-এক করে।"

প্রথমে এলেন পারুল হালদার। বললেন, "সাতটা নাগাদ যেমন আসি এসেছিলাম। সদর দরজা খোলাই ছিল। অবশ্য এমন মাঝে-মধ্যেই হয় আজকাল। সকালে উঠে হাঁটতে যাওয়ার অভ্যেস দাদাবাবুর। দরজা বন্ধ করতে ভুলে যেতেন। বেল দিয়ে সাড়া না-পেয়ে একটু ঠেলেছি, দেখি খোলাই রয়েছে। ভিতরে ডাকাডাকি করলাম, সাড়াশব্দ নেই।

শেষে শোয়ার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি, দাদাবাবু মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। মাথা ঘুরে গেছিল দেখে আমার, কোনও মতে স্যামদাদাদের ডাকি। কানাইদাকেও তুলি ঘুম থেকে। স্যামদাদা পুলিশকে ফোন করে।"

"কাউকে বা কোনও কিছুতে সন্দেহ..." জিজ্ঞেস করল কাবুলদা।

"জানি না, তবে আমি যখন কাজে আসি, দেখি মনোজবাবুও এ দিকে আসছেন। কেমন যেন চিন্তার ছাপ মুখে। আর ঘরে এসি চলছিল। দাদাবাবু কখনও এসি চালাতেন না। জানলা খুলে রাখতেন। চোদ্দো বছর কাজ করছি এ বাড়ি। আগে রাতেও থাকতাম।"

বসাককাকু বললেন, "মনোজবাবুর ব্যাপারটা জানি, বলছিলেন গত কাল পার্সটা ফেলে গেছিলেন। রাতে আর না-ফিরে সকালেই চলে এসেছেন।"

এ বারে মনোজ বর্মণই। বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন। কাবুলদার মতোই লম্বা। প্রায় ছ' ফুট। ভাল স্বাস্থ্য। চাপদাড়ি, কিন্তু মাথায় একটিও চুল নেই। মুখে বেশ একটা ভালমানুষি ভাব। বললেন, "নর্থ বেঙ্গলে একটা হোটেলে ম্যানেজারি করতাম। দুলালদা বেড়াতে গিয়ে আমার হোটেলেই ওঠে। অফার দেয় এখানে কাজের জন্যে। আমিও দুলালদার মতোই। নির্দায়। চলেই এলাম। দেখতে-দেখতে দশ বছর পেরোলও। ভাবতেই পারছি না, এমন দিন দেখতে হল।"

কাবুলদা বলল, "কাউকে সন্দেহ করেন?"

"সন্দেহ যদি বলেন, রজাররা ছাড়া আর কে হতে পারে? বিদেশের অফারটা পাওয়ার পর থেকে তো পাল্টেই গেল একদম। প্রতি দিন অশান্তি দুলালদার সঙ্গে। অথচ দেখুন, দুলালদা কত স্নেহ করত। একটা গোটা ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছিল মুফতে। বেহালা হারানোর নাটকটাই ধরুন না। শুনলাম আজকেই বলছে ওটা নাকি ছাদের ভাড়ার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। মিথ্যে কথা না, কারও নজরে পড়ল না?"

"হুম। গত কাল দশটা-এগারোটার সময় আপনি কী করছিলেন?"

"কী আর করব? কাল রোববার হলেও কাস্টমার ছিল না। ন'টা নাগাদ রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দিতে বলে দুলালদা। দু'টি ছেলে আছে, টেবিল ওয়েট করে, দীপ আর রাজু। ওদের ছেড়ে দিয়ে একটু কোল্ড কফি করি সবার জন্যে। রোজ তো স্যামই করে। খাওয়া শেষ হলে বেরিয়ে পড়ি। পৌনে দশটা মতো হবে।"

"আপনি কোথায় থাকেন?"

"কাছেই, সেলিমপুরে। হেঁটেই যাতায়াত করি। কাল আমার ড্রয়ারে পার্সটা ফেলে গেছিলাম। সকালে খেয়াল হতে চলে আসি। ঢুকে দেখি এই কাণ্ড। পুলিশ এল সাড়ে আটটা নাগাদ।।"

পরের জন নিরাপত্তারক্ষী কানাই নস্কর। নরেন্দ্রপুরে বাড়ি। তিনটেয় রেস্তরাঁ খোলে, ইনি আসেন দুটোয়। থাকেন সকাল আটটা অবধি। রোগা-পাতলা। হাবভাব সন্ত্রস্ত। বয়স ষাটের কাছাকাছি।

এঁরও সন্দেহ রজারের উপর। কারণ জিজ্ঞেস করতে বললেন, "রেস্টুরেন্টের পিছনে বাথরুমে আছে। বেরোতে যাব, দেখি রজার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে পা চালিয়ে। হাতে একটা ফুলদানি। আমাকে দেখেনি। সাড়ে এগারোটা বাজে তখন। আমার জাগার কথা, এত খুব ঘুম পাচ্ছিল দোতলায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। ওইটাই দোষ হল আমার।"

সে চলে যেতে বসাককাকু বললেন, "বুঝতে পারছ? ওই ফুলদানিটাই মার্ডার ইনস্ট্রুমেন্ট। কানাইবাবুর কথা মতো ছাদের স্টোররুম থেকে পাই। দুলালবাবুর কম্পিউটার টেবিলে থাকত। ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়তো নেই, কিন্তু ব্লাড-স্টেন আছে। ফরেন্সিকে পাঠিয়ে দিয়েছি। আপাতত তিন তলায় ক্লোজ় করে রেখেছি দুই ভাইকেই। কথা বলবেন?"
কাবুলদা বলল, "অকুস্থলটা আগে দেখে নিই।"

অকুস্থল মানে দুলালবাবুর বেডরুম। মাঝারি মাপের ঘর। একদম জানলা ঘেঁষে বিছানা। জানলার হালকা পর্দাগুলো সরানো থাকলেও পাল্লাগুলো বন্ধ। বিছানাও লন্ডভন্ড। চাদরে রক্তের দাগ। কেমন একটা লাগছিল দ্যুতির। বিছানার পাশেই একটা কম্পিউটার টেবিল। মনিটর শুয়ে রয়েছে। নীচে পড়ে আছে মাউস। অন্য দিকে আসবাব বলতে একটা সোফা। কাঠের সেন্টার টেবিল। কাঠের পাল্লাওয়ালা একটা দেওয়াল আলমারি আর ওয়ার্ডরোবও রয়েছে।

দুলালবাবুর হার্টের অসুখ ছিল। ক'দিন ধরে সাইনাসেও ভুগছিলেন। টেবিলেই ওষুধ সব থাকত। সেগুলো লাল মেঝেয় পড়ে আছে কিছু। কয়েকটা প্লাস্টিকের ফুলও ছড়িয়ে রয়েছে।

বসাককাকু বললেন, "ফুলগুলো ওই পিতলের ভাসে ছিল। আমাদের ডাক্তার যা বলল তাতে এ ঘরে মার্ডার ইনস্ট্রুমেন্ট বলতে ওটাই। এ ছাড়া মেনশনেবল বলতে একটা নোটবুক ছিল ড্রয়ারে। এটা-সেটা লিখে রাখতেন। তাতে এক উকিলের নামও রয়েছে। জুনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আমাদের কথাও লিখেছেন 'নো কে পি হিয়ার'। মানে কলকাতা পুলিশ আর কী। পুলিশ এড়াতে চাইছিলেন

কেন কে জানে।"

কাবুলদা এর মধ্যে খাটের নীচ থেকে রুমাল দিয়ে ইঞ্চি খানেক লম্বা সাদা একটা ক্যাপ বের করেছে, "মনে হচ্ছে কোনও লিকুইড ওষুধের ঢাকনা। নেজাল স্প্রে-র ক্যানিস্টারেরও হতে পারে," ঢাকনাটা শুঁকে বলল ও।

বসাককাকু সেটা সেলোফেনের একটা খামে ভরে বললেন, "এ বার কী? তিন তলায় চলুন, সাসপেক্টের ডেরায়।"

কাবুলদা দোতলার কানাইবাবুর বারান্দায় ঘুমোনোর জায়গাটাও দেখে নিল। ছোট একটা টেবিলে কানাইবাবুর টুকিটাকি জিনিসের সঙ্গে একটা ছ'ইঞ্চির স্টিলের টর্চও শোয়ানো।

কাবুলদা বলল, "রজার বলছিল না রাত্তিরে কে টর্চ জ্বালিয়ে ঘুরছিল? টর্চটা সাবধানে নিন তো ফিঙ্গারপ্রিন্টের জন্যে।"

চৌকির নীচে আধখাওয়া অনেক সিগারেটের টুকরো ছিল। তা-ও সংগ্রহ হল। বসাককাকু বললেন, "তুমি পারোও বটে। সবই ক্লু ভাবছ। নীচে নো-স্মোকিং লেখা না? উপরে খেতে তো নিষেধ নেই।"

কাবুলদা কিছু বলল না। বসাককাকুর মোবাইল থেকে দুলালবাবুর অন্তিম ফটোটাও দেখল ভাল করে। মৃত্যুর আগে কিছুটা লড়াই করেছিলেন। নাকের চার পাশটা ফুলে লাল হয়ে আছে।

মুখটা বিকৃত।

"দুলালবাবুর মোবাইলটা পাওয়া গেছে?" দ্যুতিই জিজ্ঞেস করল।

"ওটাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কল-রেজিস্টার, হোয়াটসঅ্যাপ সব চেক করতে হবে..." থামলেন বসাককাকু, কল এসেছে সেলফোনে। একটু শুনেই বললেন, "ঠিক আছে। ওই রেস্টুরেন্টেই বসান। আমি আসছি!

"বুঝুন দেখি, রজার ছোকরা স্টেটমেন্ট চেঞ্জ করতে চাইছে এখন।"

(২)

ক্যাফে মিউজিকা সত্যি বেশ সাজানো-গোছানো। এক দিকে আধুনিক ছাঁদে কাউন্টার। পাশে প্লাইউডের পার্টিশন দিয়ে একটা লম্বাটে রুম। সেখানে বসতেন দুলালবাবু। অন্য দিকে ছোট একটা গোল পোডিয়াম। ওখানে দাঁড়িয়েই বাজায় রজার। ইতিমধ্যে এসে গিয়েছে সে। রোগা-পাতলা, ফরসা। সাড়ে-পাঁচ ফুট মতো হাইট। ভাবুক মুখে চিন্তার ছাপ। শেভ করেনি ক'দিন। তার দাদা স্যামুয়েলও এসেছে। চেহারায় আদল থাকলেও বয়সে অনেকটা বড় মনে হল।

"স্যর, ছাদে রাখিনি আমি ভায়োলিনটা। কী হয়েছিল বলছি," বসাককাকুকে দেখেই বলে উঠল সে।

"আবার মিথ্যে কথা? কাল দুলালবাবুর ঘরে কেন ঢুকেছিলে?" বসাককাকু ধমক দিলেন। রজার ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছে।

"শান্ত হয়ে বলুন। আপনি একাই সাসপেক্ট না," বলল কাবুলদা।

মনে হল ভরসা পেল সে, "স্যর কাল কেন, গত এক মাসে আমি দুলালদার ঘরে যাইনি। আর এটা ঠিক, আমাদের বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে দুলালদার সঙ্গে একটু মনোমালিন্য হচ্ছিল। তাও সেটা স্যামের সঙ্গেই বেশি। আমার দেশ ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে নেই তেমন। স্যামকে বলেছিলাম একলা যেতে। কিন্তু তা ও যাবে না। আসলে তখনই বুদ্ধি করে ভায়োলিনটা লুকিয়ে ফেলি আমি। ওটাও সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। স্যাম দমে যায়। একশো দশ বছরের ভায়োলিন। জার্মানির গুয়ারনেরি মডেলের কপি। আমাদের পরিবারের জিনিস। খুব কষ্ট হচ্ছিল ওটা নিজের কাছছাড়া করতে। ঠিক করেছিলাম সময় মতো বের করব। কিন্তু স্যাম যে ইনসিয়োর্ড টাকা ক্লেম করে বসবে, বুঝিনি। আসলে টাকা-পয়সা থেকে শুরু করে সব রকম পেপারওয়ার্ক ও-ই করে। সইয়ের দরকার হলে করে দিই। কিসে করছি, অত-শত দেখি না। ক্লেম লেটারেও না দেখে সাইন করেছিলাম। কিন্তু কেসটা যখন পুলিশে গেল, ঠিক করলাম ভায়োলিনটা বের করে আনব। কিন্তু এই সব কাণ্ড যে হবে..."

"বাপু, ওটা রেখেছিলে কোথায়?" বসাককাকু বাধা দিলেন।

"এই ক্যাফের নীচেই। এর নীচে একটা লুকোনো ঘর আছে। আসুন দেখাচ্ছি," দুলালবাবুর প্লাইউড চেম্বারে ঢুকল সে। টেবিল-চেয়ার, ল্যাপটপ নিয়ে ছিমছাম সাজানো। সামনের আর সাইডের একটা দিকই অবশ্য প্লাইউডের। সামনের কিছুটা অংশ কাচেরও। দুলালবাবু চেয়ারে বসে লক্ষ রাখতেন কাস্টমারদের। পিছনের দেওয়ালে পাশাপাশি দুটো কাঠের দেওয়াল আলমারি। প্রথমটায় রেস্তরাঁর ডেলি কালেকশন, বিজনেস পেপার্স ইত্যাদি থাকে। সেটা আপাতত লকড। অন্যটার লকটা খারাপ হয়ে গেছে। খোলাই রয়েছে। সেখানে দুলালবাবুর পুরনো কিছু জামা-কাপড় ঝুলছে। একটা লাইফ সাইজ আয়নাও সেট করা পিছনে।

রজার বলল, "ভায়োলিনটা লুকোতে রাত্তিরে এ দিক ও দিক নেড়ে-ঘেঁটে দেখতাম। এই আয়নাটা তখনই আবিষ্কার করি। ভাবলাম রুমাল দিয়ে একটু মুছি, তা করতে গিয়ে আয়নাটা একটু যেন এগিয়ে এল। টানতে দরজার পাল্লার মতো খুলেই গেল। দেখি পিছনে একটা দরজাই। একটা কি-হোলও রয়েছে দেখলাম," বলতে বলতে সে সত্যি আয়না সরিয়ে দরজাটা বের করেছে। বলল, "লক সিস্টেম থাকলেও খোলাই ওটা। ঠেললেই সরে যাবে। সিঁড়ি আছে, একটু নামলেই দেখবেন কত বড় ঘর। ফিল্মের মতো একদম। পছন্দ মতো একটা জায়গায় কেসসুদ্ধু ভায়োলিনটা রেখে ঢেকে দিই। গতকাল রাত্তিরে সবার চোখেই ঘুম। মনোজদার কোল্ড কফি খেয়ে কি না কে জানে। আমি অবশ্য গলায় ব্যথা ছিল বলে পুরোটা খাইনি। ঘুম পেলেও ঠিক করি আজই..."

"সে বুঝলাম, কিন্তু দরজা তো লক্ড মনে হচ্ছে," বললেন বসাককাকু।
"লক্ড? খোলাই তো ছিল। রাত্তিরেই তো ভায়োলিনটা বের করে নিয়ে গেছি।"
"কত রাতে?"
"ইয়ে, সাড়ে-এগারোটা হবে।"

"যাও, চুপটি করে গিয়ে বোসো," বললেন বসাককাকু। মনোজ বর্মণকে নিয়ে আসতে হুকুম দিলেন। সে-ও হতবাক। এমন কোনও গুপ্ত দরজা বা ঘর যে আছে, সে-ও জানে না। দুলালবাবুর টেবিলের ড্রয়ারে চাবি ছিল কতগুলো। তার একটিও ওই লুকোনো দরজার চাবি না।

যাই হোক, দরজা কিছু ক্ষণের কসরতে খোলা গেল। ভিতরে অপরিসর একটা সরু কংক্রিট-শ্যাফট। লোহার সিঁড়ি ফিট করা তাতে। কয়েক ধাপ নামলে বড়সড় একটা ঘর বা বেসমেন্ট। কী সব জিনিসপত্র ভর্তি। বেশির ভাগই প্লাস্টিকে ঢাকা। বসাককাকু এক জন সঙ্গী নিয়ে ভিতরটা পর্যবেক্ষণ করে যখন বেরোলেন, চোখ গোল গোল।

"কেস জটিল। লালবাজারে খবর দিতে হবে," বললেন কঠিন মুখে, তার পর গলা নামিয়ে কাবুলদাকে বললেন, "দুলালবাবুর ঘরে আসুন এক বার।"

দুলালবাবুর ঘরেও একটা দেওয়াল আলমারি। সেটার একটা পিঠেও আয়না। এবং আয়নার পিছনে একই রকম লুকোনো দরজা। তবে এটাও বন্ধ। চাবি ছাড়া খোলা যাবে না।
"তোমরা আপাতত যাও। কাজ আছে অনেক। পরে কথা হবে," বললেন বসাককাকু।

দ্যুতিরা যখন বেরিয়ে এসেছে সাইকেল করে হুড়মুড়িয়ে এলেন পারুলমাসি, "একটু দাঁড়াবেন স্যর। দেখুন তো এটা কী পড়ল বাস্কে? পাশের বাড়িতে কাজের জন্য ডাকছিল, কথা বলতে যাই। এ বাড়ি এসে সাইকেলটা নিয়ে বেরোব, একটা কাক ঠোঁটে তুলে এনে ফেলল। কেমন লালচে দাগ, কে জানে দুলালদাদাবাবুর কি না, ব্যবহার করতে দেখেছি। আমি হাত দেব না।"

তাকাতে মনে হল অনুমানটা হয়তো ঠিক পারুলমাসির। সাইকেলের বাস্কেটে রক্তমাখা একটা নেজ়াল স্প্রেই বটে।

(৩)

দু'দিন কেটেছে ইতিমধ্যে। বিকেল চারটে এখন। ক্যাফে মিউজ়িকায় জড়ো হয়েছে সবাই। বসাককাকুরা তো আছেনই, গোমস ভাইরা, মনোজ বর্মণ, কানাই নস্কর, এমনকি পারুল হালদারও।

কাবুলদার হাতে ভার পড়েছে সেই সাবেকি কায়দায় অপরাধীর মুখোশ উন্মোচন করার। সবার উপরে এক বার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শুরু করল ও, "আমি শুধু কে, কেন এবং কী ভাবে এই কুকর্মটি করল সে বিষয়েই বলব। প্রথমে দেখব দুলালবাবু মারা গেলে কার সবচেয়ে বেশি লাভ। তদন্তে উঠে আসছে মনোজবাবুর নাম।"

"এ কী দাদা? আপনি যে আমাকেই টার্গেট করে বসলেন!" বলে উঠলেন মনোজবাবু।

"যা বলছি আগে শুনুন," বলল কাবুলদা, "দুলালবাবু সৎ লোক ছিলেন না। এই ক্যাফের আড়ালে নানা রকম চোরাই বিজনেস করতেন। পাঁচমিশালি বাতিল জিনিসের সঙ্গে সে জিনিস রাখা হত বেসমেন্টে। হতে পারে আপনি প্রথমে জানতেন না, কিন্তু জানার পর নিজেও এর পার্টনার হন। বেসমেন্টে যে সব নথি এবং জিনিস পাওয়া গেছে, তাতে বোঝা যায় আপনিও জড়িত। উনি আপনাকে এ জন্য এ বাড়িরও উত্তরাধিকার করেন। কিন্তু এতে আপনার মন ভরেনি। আপনি চাপ দিচ্ছিলেন বাড়িটা প্রোমোটারের হাতে তুলে দিতে। মহামারির পর চোরাই ব্যবসাও তেমন চলছিল না। কিন্তু বাড়ি বিক্রি করবেন না দুলালবাবু। ঠিক করেন উইলও পরিবর্তন করবেন। এ জন্যে জুন মাসে উকিলের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টও ঠিক করেন। আপনার মোবাইলের কল-লিস্ট ইতিমধ্যেই চেক করা হয়েছে। পারিখ রিয়েলটরের মালিক কুন্দন পারিখকে কত বার ফোন করেছেন, কিংবা নিজে গিয়েও দেখা করেছেন ওঁর অফিসে, সব তথ্য হাতে এসেছে।"

"আরে সে তো দুলালদার কথাতেই যাই।"

"হয়তো না। তা হলে দুলালবাবু নোটবুকে লিখে রাখতেন না 'নো কে পি'। এই কে পি কলকাতা পুলিশ নয়, রিয়েলটর কুন্দন পারিখ। যা-ই হোক, এ বারে সত্যি করে বলুন তো, এ বাড়ি থেকে কখন বেরিয়েছিলেন সে দিন?"

"অনেক বার বলেছি। খুব বেশি হলে পৌনে দশটার মধ্যে বেরিয়ে যাই। সবাই জানে। স্যাম, রজার। কিন্তু সত্যি কি বলবে এখন? কানাই, তুমি বলো না!"

কানাইবাবু আমতা-আমতা মুখে উঠে দাঁড়ালেন, "হ্যাঁ, দুলালস্যার নিজের ঘরে ঢুকে যেতে উনিও বেরিয়ে পড়েন। পৌনে দশটাই হবে তখন।"

"ঠিক আছে। আপনি দিনে ক'টা সিগারেট খান?"

"সিগারেট! ইয়ে মানে, আগে খেতাম। ছেড়ে দিয়েছি।"

কাবুলদা বলল, "কিন্তু খুনের পর দিন সকালে আপনার চৌকির নীচ থেকে সিগারেটের খাওয়া-আধখাওয়া সাতটা টুকরো পাওয়া গিয়েছে। ঠিক করে বলুন কাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন রাত্তিরে? বিপদে পড়বেন মিথ্যে বললে।"

"ইয়ে মানে ম...মনোজবাবু ছিলেন। তবে বড় জোর দশটা পর্যন্ত। নীচে সিগারেট খাওয়া মানা, তাই। আমি উপরে উঠে আসতেই চলে যান।"

"আপনি দেখেছেন যেতে?"

"ইয়ে, মানে হ্যাঁ। নেমে যেতে দেখি। তার পর তো ঘুমিয়ে পড়ি। উঠি সেই সকালে পারুল যখন ডাকল।"

"তা-ই হলে রজারকে কী ভাবে দেখলেন ফুলদানি হাতে উপরে উঠতে? তা ছাড়া মনোজবাবু বেরিয়ে যেতে সদর দরজা ওই ভাবে খোলাই রইল? না কি কারও জন্যে ইচ্ছে করেই খুলে রেখেছিলেন? থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে?"

কেঁদে ফেললেন কানাই নস্কর, "স্যার, দরজা খোলা থাকাটা আমার বিরাট ভুল। কিন্তু রজারের বিষয়টা আমার কিছু করার ছিল না। সকালে মনোজবাবু আমাকে আড়ালে নিয়ে যান। পুলিশ আসেনি তখনও। বললেন, তাঁরও শরীর কেমন করছিল। রেস্টুরেন্টে বসে ছিলেন কিছু ক্ষণ। বেরোনোর সময় দেখেন রজার ফুলদানি হাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। টাইম, ওই সাড়ে এগারোটা। বললেন, তিনি এ কথা বললে বিশ্বাস করবে না কেউ। তাই আমি যেন বলি। এ-ও বলেন, দুলালস্যার মারা যাওয়ায় তিনিই এখন মালিক। কথা না শুনলে ছাড়িয়ে দেবেন পরে। এই বয়সে স্যার..."

চেঁচিয়ে উঠলেন মনোজবাবু, "কী সব নাটক করছেন আপনারা!"

কাবুলদা আমল না দিয়ে বলল, "এ বারে একটা জিনিস দেখাই, দেখুন তো চিনতে পারেন কি না?"

পুলিশের এক জন সেলোফেনের একটা প্যাকেট ধরল মনোজবাবুর সামনে। ভিতরে সেই নেজ়াল স্প্রে-র ক্যানিস্টারটা। পারুলমাসি সে দিন যেটা দিয়েছিল।

"এটা আমায় দেখাচ্ছেন কেন? আমি কি নাকে স্প্রে নিই?"

"আপনি নেন না। কনজেশনের জন্য দুলালবাবু নিচ্ছিলেন। স্টেরয়েড নেজ়াল স্প্রে। খুব বেশি

মাত্রায় এক সঙ্গে নিলে বিপজ্জনক। এতে দুলালবাবুর ব্লাড, নেজ়াল মিউকাসের সঙ্গে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্টের ট্রেসও রয়েছে। আসলে কুকর্মটি করার পর জানলা থেকে ওটা ছুড়ে ফেলেন। অথবা দুলালবাবুই কেড়ে নিয়ে বাইরে ছুড়ে দেন। জানলা তখন পুরো খোলাই ছিল, যা আপনি পরে বন্ধ করেন। ও দিকে স্প্রে-টা গিয়ে পড়ে পাশের বাড়ি। যা কিনা কাকতালীয় ভাবে একটি কাক ঠোঁটে তুলতে গিয়ে পাঁচিলে হেলান দিয়ে রাখা পারুলমাসির সাইকেলের বাস্কেটে ফেলে। স্প্রে-টার চিন্তাটা আপনার মাথায় ছিল। এই জন্যে কানাইবাবুর টর্চ নিয়ে সে রাতেই নীচে খোঁজাখুঁজি করছিলেন। রজারের গলার আওয়াজে পালিয়ে যান। কিন্তু আবারও ভুল করলেন। টর্চটা সঙ্গে নিয়ে ফিরে যান। পার্স না, সকালে আসেন আর এক বার দিনের আলোয় স্প্রে-টা খুঁজতে এবং টর্চটা রেখে যেতে। কানাইবাবু ওটা প্রায় ব্যবহারই করেন না। নয়তো জানতেন না ওর টেবিল থেকে ওটা কখন পুলিশের হেফাজতে চলে গিয়েছে। ওতেও আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট রয়েছে।”

মনোজবাবুর আস্ফালন শেষ। দু'হাতে মুখ ঢেকে মাথা নামিয়ে নিয়েছেন।

কাবুলদা বলে চলল, “সে দিন কফিতে ঘুমের ওষুধই মিশিয়ে ছিলেন মনোজবাবু। তার পর দোতলায় কানাইবাবু যেখানে শোন, সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। উত্তেজনায় পর পর সিগারেট খেয়ে গিয়েছেন। কানাইবাবু চলে আসেন দশটা নাগাদ। ওষুধের প্রভাবে চোখ ঢুলু ঢুলু। মনোজবাবু আরও কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করে নীচে নামেন। সব প্ল্যানমাফিক। কিন্তু ক্যাফেতে ঢুকেই চিত্তির। গুপ্ত কক্ষের প্রবেশদ্বার থেকে বেহালার বাক্স ঘাড়ে বেরিয়ে আসছে রজার। নিশ্চয়ই দুলালবাবুর কীর্তি। দরজা কখনও খুলেছিলেন, কিন্তু লক করতে ভুলেছেন। রজার অবশ্য মনোজবাবুকে দেখেনি। সে কোনও দিকে না-তাকিয়ে দ্রুত উঠে যায় তিন তলায়। ব্যস, আর কী? মনোজবাবু গুপ্ত দরজা দিয়ে বেসমেন্টে ঢুকলেন। ডুপ্লিকেট চাবি করাই ছিল। কপাট বন্ধ করে দিলেন ভিতর থেকে। তার পর উল্টো দিকের দরজা দিয়ে ঢুকলেন দুলালবাবুর বেডরুমে। হয়তো সে দরজাও খোলা ছিল। অবশ্য খোলা না-থাকলেও অসুবিধে নেই। দু'দিকের কপাটের একই চাবি। ও দিকে দুলালবাবু ওষুধের ঘোরে আচ্ছন্ন। আনাড়ি অপরাধীর মতো ক্রাইম করবেন না মনোজবাবু। গুগল করে জেনেছেন নেজ়াল-স্প্রে একবারে অত্যধিক পরিমাণে নিলে বয়স্ক, বিশেষ করে হার্টের রোগীর পক্ষে প্রাণঘাতী। সুতরাং তা-ই করলেন। সে জন্যে দুলালবাবুর নাক ওই রকম ইনফ্লেমড, রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুশকিল হল ইন্টারনেটে সব তথ্য তো থাকে না। থাকলেও সকলে ঠিক ভাবে বোঝেও না। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন না দুলালবাবু। বরং ঘুমের ঘোর কেটে আততায়ীকে চিনেও ফেলেন। তখন বাধ্য হয়ে টেবিলে রাখা পিতলের ফুলদানি দিয়ে মাথায় আঘাতটা করতে হয়। এর পর যা হয়, দ্রুত হাতের ছাপটাপ সব মুছে ফেলা। প্রমাণ, ক্লু বা সূত্র, যা কিছু আছে সব বিনষ্ট করা। সব করেওছিলেন স্নায়ুকে বাগে রেখে। এমনকি রজারকে ফাঁসাতে ফুলদানিটা ছাদে গিয়ে রেখেও আসেন। দুলালবাবুর ফ্ল্যাটের দরজাও ভেজিয়ে রাখলেন। কানাইবাবুকে বশও করলেন ভয় দেখিয়ে। কেবল ওই স্প্রে-র ক্যানিস্টারটা নাগালের বাইরে চলে যায়। এই জন্যেই ক্যাপটাও অবশ্য চোখ এড়িয়ে গেছিল। আর বেসমেন্টের নকল এবং আসল চাবি দুটোই হয়তো ওঁর সেলিমপুরের ফ্ল্যাট সার্চ করলে পাওয়া যাবে।”

থামল কাবুলদা। মনোজবাবুকে দু'জন পুলিশ বাইরে নিয়ে গেল।

বসাককাকু কাবুলদার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, “আমি অভিভূত। হ্যাটস অফ টু ইউ!”

তার পর রজার-ভাইদের দিকেফিরে বললেন, “তোমাদেরও বলি, আর কখনও এমন কাজ কোরো না। এ যাত্রায় ছেড়ে দিলাম। তবে কানাইবাবুর অপরাধ আছেই। মিথ্যে সাক্ষ্যের। বড় মূর্খ লোকটা!”
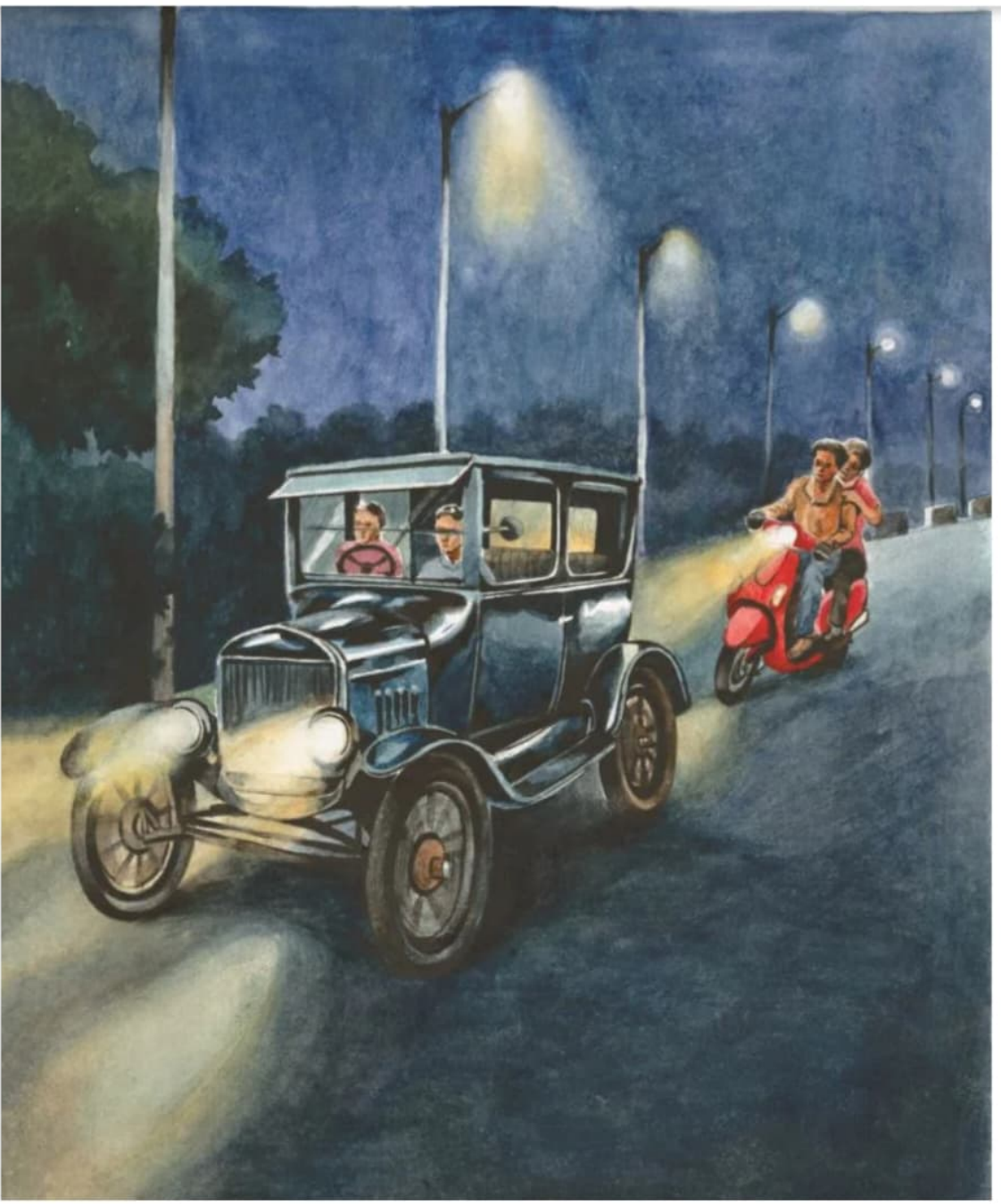
ছবি: সুমন পাল

আপন সখার খোঁজে

অভ্রর কথা শুনে কেমন যেন নাচের ভঙ্গিমায় হাত-পা নেড়ে “কী মজা, কী মজা,” বলতে বলতে ল্যারি বেরিয়ে গেল। “এ তো পুরো পাগল রে! পিসি একটা পাগলকে নিয়ে থাকেন?” নিলুর কথায় বাকিরা হেসে উঠল।

অনীশ মুখোপাধ্যায়

শাক্য চায়ে চুমুক দিয়ে অভ্রদীপকে জিজ্ঞেস করল, “গাড়িটা যে ওখানে নেই, সেটা কি তুই এখানে এসে জানতে পারলি?”

“আসার দিন তিনেক আগে শুনলাম। কী ঝঞ্ঝাট বল দেখি! চার দিনের জন্য এসে এ বারে না চোদ্দোটা দিন...”

“অ নিলু! কত দিন পরে এলি বাবা! তোর বন্ধু ধরে আনল বলে তবু দেখা পেলুম। ওই ছেলেটা কে? যেন চিনি-চিনি মনে হচ্ছে!”

ঘরে প্রবেশ করেছেন যিনি, তাঁর বয়স আশির কাছাকাছি। অভ্রদীপের সেজো পিসি। থাকেন প্রান্তিকের কাছে। ভাইপো এসেছে বলে ক’দিন হল ঝিমনাগড়ের বাড়িতে উঠেছেন। নিলু আর শাক্যকে উনি আগেও এখানে দেখেছেন। অভ্রর সঙ্গে ওরা তখন কলেজে পড়ত।

ওরা পিসিকে প্রণাম করার পরে ভদ্রমহিলা বললেন, “মনে পড়েছে। শাক্য তো?”

শাক্য হেসে বলল, “পিসি, আপনার মেমরি তো একদম ফ্রেশ!”

“ধুর! সব ভুলে যাচ্ছি। তায় কানে কম শুনি। চোখে কম দেখি। ক’দিন থাকবি তো?”

নিলু বলল, “থাকব পিসি।”

“তোর সেই বন্ধুটা কোথায় রে? চোর-ডাকাত ধরে শুনেছিলাম!”

নিলু হেসে বলল, “পিসি, তুমি তার কথাও জানো?”

“জানি তো!”

“সে চাকরির পরীক্ষা দেওয়ার জন্য গত সপ্তাহে বাড়ি গেছে গো!”

“অ! তা তোরা একটু দ্যাখ না! অত দামি গাড়িটা চুরি হয়ে গেল! সবাই চেষ্টা করলে...”

অভ্র বলে, “ওরা নিশ্চয়ই দেখবে পিসি। তুমি এ বারে ভিতরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করো।”

পিসি চলে যাওয়ার পরে শাক্য জানতে চাইল, “গাড়িটা কি তোর দাদুর কেনা?”

"দাদুর বাবা সহদেব সেন রায় কিনেছিলেন। পুরনো, বেশ লম্বা, বুঝলি!"

"কত পুরনো?"

"শুনেছি ১৯২৬ নাগাদ সেটা এখানে এসেছিল।"

"গাড়িটার কোনও ফটো আছে?"

অভ্র মোবাইল থেকে একটা ছাই রঙের লম্বা গাড়ির ফটো বের করে এগিয়ে দিল।

"গাড়িটা চলত?" নিলু ফটো দেখতে দেখতে জানতে চাইল।

"গত বছর এসে বাবা অনেক টাকা খরচ করে ওটাকে রানিং কন্ডিশনে নিয়ে আসেন। আমিও ছিলাম। চল্লিশের বেশি স্পিড ওঠেনি। কিন্তু বেশ একটা ফুরফুরে টাইপ ফিলিং..."

"জমিদার মার্কা?" নিলু হেসে বলে।

"একদম। এ বারে বোঝ! গাড়ি হাওয়া। কে নিয়েছে আর কবে নিয়েছে, সে সব বুঝতে বুঝতেই আমার ছুটিটা শেষ হয়ে যাবে!"

অভ্র থেমেছে। ওরা কেকের প্লেটটা তুলে নিল। ঝিমনাগড়ে সহদেব সেন রায়ের জমিদারি ছিল। সেকেলে জমিদারবাড়ি যেমন হয়, এ বাড়িও প্রায় তার কাছাকাছি আকারের। কিন্তু কালের নিয়মে তার ভগ্নপ্রায় দশা। সব মিলিয়ে পাঁচটি ঘর এখন বাসযোগ্য আছে। হিমাদ্রি লাহা নামে এক জন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এ বাড়ির কেয়ারটেকার। যদিও এখন তিনি আক্ষরিক অর্থেই অথর্ব। তাঁর ছেলে মলয় বাড়িটা খানিক দেখাশোনা করে।

"তোর কি এখন আসার কথা ছিল?" নিলু খেতে খেতে অভ্রকে জিজ্ঞেস করে।

"না, না! বাবা ক'দিন আগে বেঙ্গালুরুর বাড়িতে পুরনো কাগজপত্তর নাড়াচাড়া করতে গিয়ে একটা বাক্স থেকে ছেঁড়াখোঁড়া এক পিস ডায়েরি পেয়েছেন। তার একটা পাতায় পিকিউলিয়ার কয়েকটা লাইন লেখা আছে।"

"কী লেখা?" শাক্য জিজ্ঞেস করে।

"'যখন থাকব না তখন আমার আপন সখার কী হবে? কার কাছে যে রেখে যাই! হারিয়ে গেলে আমি কি মরেও শান্তি পাই?' এই রকম আর-একটা পাতায় লেখা— 'আমার

আপন সখার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে শান্তি পেয়েছি।'"

শাক্য বলে, "এ তো রীতিমতো হেঁয়ালি! এটা কে লিখেছেন?"

বাবার ধারণা, ওঁর দাদুর লেখা। ডায়েরিটা আদারওয়াইজ় ফাঁকা।

"আর আমার আপন সখা মানে? সোনাদানা? দামি গয়না?"

"সেটা জানার জন্যই তো এসেছিলাম। অবশ্য আর-একটা কারণও আছে।"

"কী?"

"গাড়িটা গত বারই বিক্রি করে দেওয়ার কথা হয়েছিল। উপযুক্ত দাম আর কেনার লোক না মেলায় সে বারে সম্ভব হয়নি।"

"এদ্দিনে লোক পেয়েছিস?"

"দু'জনের সঙ্গে কথা এগিয়েছে। কিন্তু তারা এত দূরে আসতে রাজি নয়। বাবা বললেন, আমাদের যে ফ্ল্যাটটা নিউটাউনে আছে, সেখানে গাড়িটা এনে রাখলে দেখা-শোনা কেনা-বেচার সুবিধে হবে। কিন্তু তার আগেই এই কাণ্ড!"

"কাউকে সন্দেহ করিস?" নিলু জিজ্ঞেস করে।

"এই আধপোড়ো বাড়িতে হিমাদ্রিবাবু আর ওঁর ছেলে মলয় ছাড়া কেউ থাকেন না। কাছাকাছি একটা লাইব্রেরি আছে। লাইব্রেরিয়ান জগন্ময় সেনশর্মার সঙ্গে বাবার পরিচয় বহু দিনের। বাবা এলে তিনি কয়েক বার আসেন। বাবার আর-এক পরিচিত পান্থলাল পাত্র মাঝে-মধ্যে এইমুখো হন। পান্থলালের ঠাকুরদা জীবনলাল, সহদেব সেন রায়ের পরিচিত ছিলেন। জীবনলালের পয়সার অভাব ছিল না। কারণ, তিনি আসলে হিরে-জহরতের কারবার করতেন। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে ভদ্রলোক বেশ অল্প বয়সে মারা যান। বাকি রইল পান্থকাকুর ছেলে প্রতীক। সে-ও বেঙ্গালুরুতে সেটলড। প্রতীক ট্র্যাভেল এজেন্সির ব্যবসা করে। মাসখানেক আগে এখানে এসেছিল।

আমি আসছি জেনে ফোন করে বলল, ফেরার পথে কলকাতা থেকে যেন ভাল চা পাতা নিয়ে যাই। এখন এঁদের মধ্যে কাকে সন্দেহ করব?"

নিলু আর শাক্য বিকেলে ঘুরতে বেরিয়েছিল অভ্রর সঙ্গে। অজয় নদীর ধারে আলপথের উপরে দাঁড়িয়ে শেষ শ্রাবণের হাওয়া খেতে খেতে অভ্র বলল, "আরও দু'জনের কথা সকালে খেয়াল ছিল না।"

"তারা কারা?" নিলু জিজ্ঞেস করে।

"দিগ্বিজয় পালিত নামে এক জন গাড়ি চুরি যাওয়ার পরের দিন এখানে এসে নাকি জানতে চেয়েছিল যে, গাড়িটা বিক্রির ব্যাপারে কার সঙ্গে কথা বলতে পারে। মলয় আমার কথা বলেছিল। আমি কবে আসব জেনে নিয়ে লোকটা চলে যায়।"

"আশ্চর্য! সে লোক জানল কেমন করে যে গাড়িটা বিক্রি হবে?"

"সেটাই রহস্য। গত কাল বিকেলে পালিত এসেছিল। বেশ কিছু ক্ষণ আমার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলে। গ্যারাজে যায়। এই বাড়ির খানিকটা ঘুরে দেখে। তার পরে জানায়, সে দুর্গাপুরে থাকে। গাড়ি উদ্ধার হলে যেন তাকে জানাই।"

"ভেরি ফানি!"

"ইনডিড সো। লম্বা চেহারা, কিন্তু পায়ে সমস্যা আছে। দুটো ক্রাচ নিয়ে হাঁটে। মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ। কাঁধের নীচে চুল নেমেছে। সামনের পাটির দুটো দাঁত বিচ্ছিরি ভাবে বেরিয়ে আছে। আর চোখে দাদুর আমলের চশমার ফ্রেম। সব মিলিয়ে উৎকট চেহারা। ঘ্যাড়ঘেড়ে গলায় বার দুয়েক হেসেছিল। বুঝে দ্যাখ, পালিত কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ নয়, যারা আগে গাড়ির ব্যাপারে যোগাযোগ করেছিল।"

"লোকটা দু'নম্বরি বলছিস?"

"হওয়ার চান্স খুব বেশি। খবরটা কোথা থেকে পেল তা-ই ভাবছি!"

"আর-এক জন?"

"সে একটা পাগল। মানে আচারে-ব্যবহারে অন্য কিছু মনে হয়নি। সর্ব ক্ষণ দাঁত বেরিয়েই আছে। ল্যারি লাহিড়ি তার নাম।"

"ল্যারি!" শাক্য-নিলু এক সঙ্গে বলে ওঠে।

"ইয়েস!"

“লোকটা কে?”

“পিসির আশ্রয়ে মাস খানেক হল আছে। পিসিকে দেখে-শুনে রাখে।”

“পিসি ওকে পেলেন কোথায়?”

“যে মেয়েটি পিসির কাছে থাকত, মাস খানেক আগে সে কাজ ছেড়ে চলে যায়। তার পরে ল্যারি নিজেই পিসিকে গিয়ে বলে যত দিন অন্য কাউকে পাওয়া না যাচ্ছে, সে ফাইফরমাশ খেটে দেবে। বিনিময়ে পিসির বাড়িতে থাকতে দিলে বর্তে যায়। পিসি তো ওকে পেয়ে মহা খুশি!”

“লোকটাকে কি সাসপেক্ট করছিস?”

“ধুর! দেখলে বুঝবি, ওকে সাসপেক্ট করার কোনও মানেই হয় না।”

“পুলিশ জানে তো?”

“ডায়েরি করেছি। গত কাল ইনস্পেক্টর দত্ত দেখেও গেলেন সব কিছু।”

“গাড়িটা যে বিক্রি হবে, এটা কারা জানতেন?”

“হিমাদ্রিবাবু আর মলয়। খুব বেশি হলে পান্থলাল পাত্রকে ওরা বলতে পারে। তবে মলয় ড্রাইভিং জানে না। নিজের এত ক্ষমতা নেই যে ওই গাড়ি বের করে নেবে।”

“কিন্তু কাউকে দিয়ে তো...”

“অসম্ভব নয়। কিন্তু কাকে দিয়ে? এই গ্রামীণ এলাকায় গ্যারেজ খুলে ভিন্টেজ কার নিয়ে পালাবে এমন লোক... কে হতে পারে? আমি জানি না।”

“গাড়ি এবং গ্যারাজের চাবি কার কাছে থাকত?”

“মলয়ের কাছে। আর সে সব দিব্যি আছে।”

“তার মানে ডুপ্লিকেট বানানো হয়েছে।”

“অবশ্যই।”

“কিন্তু তা হলে মলয়কে এক বার জিজ্ঞেস করা উচিত।”

“এই ব্যাপারে যে ওর কোনও আইডিয়া নেই, পুলিশকে জানিয়েছে।”

“ফটোটা আর-এক বার দেখি!” নিলু অভ্রকে বলে।

অভ্র মোবাইল থেকে এ বারে আগেরটার সঙ্গে আর-একটি ফটোও বের করে এগিয়ে দেয়। শাক্য-নিলু বেশ কিছু ক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকে। প্রথমটি সামনে থেকে তোলা। লম্বা ইঞ্জিনের নীচে নম্বরপ্লেট ঝক ঝক করছে— এএএস-ওয়ান সেভেন নাইন থ্রি। অন্য ফটোটি সাইড থেকে ওঠায় গাড়ির দৈর্ঘ্য বোঝা যাচ্ছে।

“আজকের বাজারে এই গাড়ির কত দাম হতে পারে?” শাক্য জানতে চাইল।

“কোনও ধারণা নেই। তবে ভাল টাকাই পাওয়া উচিত।”

রাতে খেতে বসার আগে ল্যারির সঙ্গে ওদের দেখা হল। লোকটির মাঝারি হাইট, পাতলা দাড়ির সঙ্গে সরু গোঁফ বেশ কায়দা করে মিশেছে। মাথায় উইগ। নির্ঘাত টাক পড়ে যাচ্ছিল।

“আজ আলু-ডিমের কষা দিয়ে পরোটা খাব। কত্ত দিন এ সব জোটে না। হি হি! সঙ্গে আবার মাংসের কিমা দিয়ে ঘুগনি! উফফ! পুরো জমে যাবে!” কথা শেষ করে যেন ভীষণ মজা পেয়েছে, এমন ভাবে হাসতে লাগল ল্যারি। নিলু আর শাক্য কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। এ ভাবে কেউ যে অচেনা লোকের সামনে...

“ঠিক আছে। যখন খাবে তখন বোলো। এখন ভাগো দেখি!” অভ্রদীপ এর মধ্যে ঘরে ঢুকেছে। সে বেশ রাগী স্বরে জানাল।

অভ্রর কথা শুনে কেমন যেন নাচের ভঙ্গিমায় হাত-পা নেড়ে, “কী মজা, কী মজা,” বলতে বলতে ল্যারি বেরিয়ে গেল।

“এ তো পুরো পাগল রে! পিসি একটা পাগলকে নিয়ে থাকেন?” নিলুর কথায় বাকিরা হেসে উঠল।

{৩}

“তোমার পিসি যে বাড়িতে থাকেন, তার হিস্ট্রিটা জানো কি?” অভ্রদীপকে পরের দিন জিজ্ঞেস করলেন জগন্ময়বাবু। ভদ্রলোকের ছোটখাটো চেহারা। মাথার পিছন দিকটায় যেটুকু চুল আছে, সবই সাদা। ফরসা মুখে দাড়ি-গোঁফের অস্তিত্ব কোনও কালেই দেখেনি

অভ্র। সে একটু ভেবে বলল, "খানিকটা জানি।"

শাক্য, নিলু আর অভ্র এখন সন্ধ্যামণি পাঠাগারের ভিতরে বসে আছে।

জগন্ময়বাবু গম্ভীর মুখে জানালেন, "প্রান্তিক স্টেশনের কাছে বহু বছর আগে একটি বাড়ি কিনেছিলেন সহদেব। বাড়িটা ছিল এক জন ডাচ সাহেবের। প্লেগে স্ত্রী এবং এক মাত্র কন্যা মারা যাওয়ার ফলে মনের দুঃখে বাড়ি-গাড়ি বেচে দিয়ে দেশে ফিরে যান তিনি। বাড়িটা সেন রায়রা কিনলেও গাড়ি অন্য কেউ কিনেছিলেন। কিন্তু গাড়ির মালিক সেটা কেনার এক সপ্তাহের মাথায় মারা যান। কিছু দিন বাদে সে গাড়ি অবশ্য তোমাদের বাড়ির গ্যারাজে ঠাঁই পায়।"

"এইটুকু জানি কাকু।"

"আর-একটু আছে। অত বড় একটা গাড়ি পিটার ভ্যান হেডেন নামে ডাচ সাহেবের কাছ থেকে যিনিই কিনে থাকুন, তিনিও বড়লোকই ছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি হুট করে কী ভাবে মারা গিয়েছিলেন?"

"আপনি জানেন সেটা?"

"নিশ্চিত ভাবে সে সব বলা কঠিন। তবে এটা জেনেছিলাম যে, হেডেন সাহেব নাকি শেষ জীবনে খুবই মানসিক যন্ত্রণায় কাটিয়েছিলেন। গভীর দুঃখে এক পরিচিতকে বলে যান, বাড়ি-গাড়ি বেচে এসেছেন বলে কষ্ট নেই। কিন্তু মনের ভুলে স্ত্রীর আঁকা গোটাকতক ছবি ফেলে আসার আক্ষেপ দগ্ধে যাচ্ছে তাঁকে। কেন যেন মনে হয়েছিল, ওগুলো বাক্সে ভরেছেন। জাহাজে ওঠার অনেক পরে দেখেন একটা ছবিও নেই। তার পর থেকে একটাই কথা ভেবে আসছি।"

"ছবিগুলো তবে কোথায়, এই তো?" নিলু জানতে চায়।

"এগজ্যাক্টলি!"

"আপনার ধারণা তার খোঁজ এত দিনে কেউ পেয়ে থাকতে পারে?" এটা শাক্যর প্রশ্ন।

"পেলে অবাক হব না। আমি জানি না, ওখানে কোথাও ছবিগুলো আছে কি না। এমনিতে কোনও সম্ভাবনা দেখি না।"

ওরা উঠতে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক বললেন, "ডুপ্লিকেট চাবি বানানো কঠিন নয়। তবে এর

জন্য দুর্গাপুর যেতে হবে। সে তো মোটে চল্লিশ মিনিটের রাস্তা। প্রশ্ন হচ্ছে, কে যেতে পারে?”

“আমরাও এটা ভেবেছি। কিন্তু কাকে যে সন্দেহ করব...”

“যে ক্রাচ নিয়ে হাঁটে, সে কাল রাতে ক্রাচ ছাড়া তোমাদের বাড়ির আশপাশে ঘুরছিল।”

“সে কী! আপনি দেখেছেন নাকি?” জগন্ময়বাবুর মুখে রহস্যময় হাসির খেলা দেখতে পেল তিন জনেই। ফেরার সময় দরজার মুখে ল্যারির সঙ্গে ওদের ফের সাক্ষাৎ হল!

কান অবধি হেসে ল্যারি বলে, “কী আনন্দ! রাত্তিরে আপনাদের জন্য পাঁঠার মাংস রান্না হচ্ছে। মলয়ের কাছে জানলাম, ডিমের ডেভিল, বাসন্তী পোলাও, চাটনি আর রাজভোগও থাকবে। কী আনন্দ! আজ বড় শুভ দিন, থুড়ি শুভ রাত!”

“আরে জ্বালা! তুমি কি কেবল খেতেই এসেছ নাকি? খালি খাই-খাই...”

ল্যারি বিচ্ছিরি ভাবে হাসতে হাসতে বলল, “আমি আসলে জাত পেটুক! কী আনন্দ!”

“গাড়িটা কী ভাবে চুরি হল? কোনও ধারণা আছে?”

ল্যারি মাথা চুলকে বলল, “আজ্ঞে আমি তো সে দিন এখানে ছিলাম না। পরের দিন এলাম।”

“সত্যি বলছ?”

“আজ্ঞে মটন বিরিয়ানির দিব্যি!” ফের দাঁত বেরিয়ে এল ল্যারির।

“তুমি একটা... উফফ!” রাগে চিড়বিড়িয়ে উঠল অভ্র।

পরের দিন সকালে নিলু মলয়কে জিজ্ঞেস করে, “গাড়িটা সহদেববাবু কার থেকে কিনেছিলেন?”

“পান্থকাকু হয়তো জানতে পারেন।”

শাক্য জিজ্ঞেস করল, “একটা লোক গাড়ি কেনার ব্যাপারে এসেছিল, জানেন তো?”

“জানি। লোকটা ভাল নয়।”

“কী ভাবে বুঝলেন?”

“পরশু রাতে ফেরার সময় দেখছিলাম মোড়ের মাথায় যে চায়ের দোকানটা আছে, তার বাইরে বেঞ্চে বসে কার সঙ্গে যেন ফোনে বক বক করতে করতে এই বাড়ির দিকে ঠায় তাকিয়ে ছিল। লোকটা ক্রাচ নিয়ে হাঁটে, কিন্তু ওর পায়ে সত্যিই ডিফেক্ট আছে কি না, সন্দেহ হয়।”

“কেন?”

“আগে এক দিন থানার মোড়ে দেখেছি। ক্রাচ বগলে ছিল। কিন্তু হাঁটার ধরনটা স্বাভাবিক,” মলয় থেমে যায়।

এ দিন বিকেলে নদীর ধারে খানিক ঘোরাঘুরি করে যখন অভ্রদের বাড়ির দিকে শাক্য আর নিলু ফিরছে, রাস্তার ধারে ছোট হোটেলের সামনে মলয়কেই দেখতে পেল ওরা। কার কথা সে এত মন দিয়ে শুনছে? নিলুদের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে লোকটা কী বোঝাচ্ছে মলয়কে?

অভ্রদের বাড়ির পিছন দিকে প্রকাণ্ড শেড দেওয়া সিমেন্টের বাঁধানো রাস্তা আছে। এখানেই গাড়িটা থাকত। অভ্ররা যে গাড়িতে এসেছে সেটাও এখানেই পার্ক করা হয়। লোহার বড় গেট দিয়ে ভিতরে ঢোকার ব্যবস্থা আছে। সেই গেটের চাবিটা মলয়ের কাছ থেকে নিয়ে ওরা দেখেছে। সেই সঙ্গে গাড়ির চাবিটাও। এ সবের বাইরে মলয়ের একটা স্কুটি থাকে। শাক্যর ইচ্ছে হল ওটা নিয়ে এক বার এমনিই বেরোবে।

অভ্র এবং নিলু পান্থলালবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল। ভদ্রলোকের বয়স অভ্রদীপের বাবার মতোই হবে। অভ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, “কেমন আছিস রে? সঙ্গে কি তোর বন্ধু? আর-এক জন এসেছে না?”

নিলুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে অভ্র বলল, “হ্যাঁ। আর-এক জন বেরিয়েছে। আপাতত তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।”

“বল।”

“গাড়িটা দাদুর বাবা কার থেকে কিনেছিলেন জানো?”

“অনুমান করতে পারি। কিন্তু প্রমাণ নেই।”

“নামটা?”

“ওই জন্যই বলতে চাইছি না।”

“ফেয়ার ডিল হয়েছিল তো?”

“একশো বছর আগে আমি কোথায়! তবে হয়েছিল বলেই তো আমার ধারণা।”

“গাড়িটা কে চুরি করতে পারে? এনি আইডিয়া?”

“যে-ই করে থাকুক তার ক্যাশের দরকার ছিল। গাড়ি বিক্রি হবে, এই খবর সে হয়তো পেয়ে থাকবে। বাকিটা নিজে অ্যারেঞ্জ করেছে।”

“আর-একটা কথা। গাড়ি চুরি করে সে কোথায় যেতে পারে?”

“কেন, কলকাতায় কার-মার্কেট নেই?”

“বেচে দিয়েছে, বলছ?”

“চান্স আছে। পুলিশ কী করছে জানি না। তবে গাড়িটা খুঁজে আনা ওদের কম্মো নয়।”

“দিগ্বিজয় পালিত নামে কারও কথা জানো? ও বাড়িতে গাড়ি কেনার ব্যাপারে খোঁজ নিতে এসেছিল।”

“শুনেছি। এই তল্লাটে লোকটা ঘুরছে। মতলবটা খুব স্পষ্ট নয়। শুধু গাড়ির জন্য?”

{৪}

ঘুমিয়ে পড়েছিল নিলু। পাশের খাটে শাক্যও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। চরাচর নিস্তব্ধ। রাত ক'টা কে জানে! নিলুর ঘুমটা ভাঙল ফোনটা দু'বার রিং হওয়ার শব্দে। পর ক্ষণেই মেসেজ ঢুকল একটা। এসএমএস। এত রাতে কে ফোন আর মেসেজ করতে পারে? ঘুমজড়ানো চোখে ফোনটা মাথার কাছ থেকে তুলে নিয়ে দেখল অচেনা নম্বর থেকে রিং করার পরে কেউ ইংরেজি হরফে বাংলা লিখেছে, ‘গাড়ি চোর পালাচ্ছে। ধরতে চাইলে এখনই ন্যাশনাল হাইওয়েতে আসা জরুরি।’

চমকে উঠল নিলু। এটা কে লিখেছে? যে-ই লিখুক, লোকটা তাকে চেনে। সব জানে। আর তাই ফোন করে কেটে দিয়েছে। নম্বরটা কার হতে পারে?

এখন ভাবার সময় নেই। ও দিকে শাক্যও উঠে পড়েছে। গোটা ব্যাপারটা বোঝাতে অভ্রদীপকেও চাই। কিন্তু সে বাড়ির অন্য অংশে ঘুমোচ্ছে। ফোন করে ডাকবে? গাড়ি চাই যে!

শাক্য বলল, "স্কুটির চাবিটা মলয়কে ফেরত দিতে ভুলে গিয়েছি। অভ্রকে ডাকিস না। চল।"

পাঁচ মিনিটের ভিতরে ওরা রাস্তায় নেমেছে। স্কুটির পিছনে নিলু। সামনে শাক্য। ফাঁকা রাস্তা ধরে ন্যাশনাল হাইওয়েতে উঠতে মিনিট পনেরো লাগল। এ বারে? ডাইনে না বাঁয়ে? কলকাতা না আসানসোল? নিলুর কথা মতো শাক্য কলকাতার দিকেই এগোল। উল্টো দিক থেকে পর পর কয়েকটি জিনিস-বোঝাই লরি পাস করেছে।

"এ ভাবে ধাওয়া করা যায়? স্কুটির স্পিড আর কত উঠবে?" নিলু পিছন থেকে বলল।

"জানি না। তোকে যে মেসেজ করেছে..." শাক্যর কথা শেষ হওয়ার আগে নিলু বলল, "দূরে ওই দ্যাখ! ওই যে রে! ও গাড়ি চল্লিশের বেশি তুলতে পারবে না। চল শাক্য।"

একশো বছরের পুরনো গাড়ির ড্রাইভার কি এতটাই বোকা? সে কি কিছুই টের পায়নি? নিলু বড়ই অবাক হচ্ছে। দুশো মিটারের কাছাকাছি যখন ওরা চলে এসেছে, ঠিক সেই সময়ে কান-ফাটানো শব্দটা ওদের দিকে ধেয়ে এল।

"শুট করছে শাক্য!" নিলু চেঁচিয়ে উঠেছে।

পর মুহূর্তেই আবার! এ বারে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। স্কুটির হেডলাইট ভেঙে খান-খান হয়ে যাওয়ার সঙ্গে হ্যান্ডেলটাও ঘুরে গিয়ে স্কুটিটা কেমন যেন আধভেজা পথে পিছলে গেল। ছিটকে পড়ল দু'জনেই। প্রবল যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠার মুহূর্তে ওদের পিছনে এসে দাঁড়াল একটি সাদা এসইউভি। দ্রুত সেখান থেকে যে নেমে এল, তাকে ওরা কেউ আশা করেনি। তার সঙ্গে আর-এক জন এগিয়ে এসে ওদের তুলে নিয়েছে গাড়িতে। আর এসইউভির ড্রাইভার স্পিড বাড়িয়েছে পরের কয়েক সেকেন্ডে। কী ঘটছে ওরা বুঝতে পারছে, কিন্তু...

তিন মিনিটের মাথায় সামনের গাড়িকে ওভারটেক করে বাঁকা ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল পিছনের গাড়িটা। তড়িৎ-গতিতে দু'জন ছুটে গেল লম্বা গাড়ির দিকে। স্কুটির দুই প্যাসেঞ্জার বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল, বাকি নাটকটা দেখার জন্য।

এসইউভি থেকে নামা দুই ব্যক্তির হাতে দু'টি রিভলভার দেখা যাচ্ছে।

লম্বা লোকটি সজোরে সামনের দরজাটা খুলে ফেলে চালকের ঘাড় ধরে নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আজ রাতে কী খেয়েছিলে? মটন বিরিয়ানি? চিকেন চাপ? কাম-অন! স্পিক আউট!"

এই গলা নিলুর চেনা। তার সামনে যে চালকের ঘাড় ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে আর কেউ নয়, ক্রাচ নিয়ে হাঁটা দিগ্বিজয়।কিন্তু এই মুহূর্তে ক্রাচের চিহ্নটুকুও নেই।

"ইনস্পেক্টর দত্ত, এই যে পান্থলালের সুপুত্র প্রতীক। দাড়িটা টেনে নিন। ল্যারি লাহিড়ি ভ্যানিশ করে যাবে। আর দোসরটিকেও চিনতেই পারছেন, আশা করি!"

চালকের পাশে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে আছে মলয়। শাক্য আর নিলু এ বারে সমস্বরে বলল, "বাপ্পা তুই! তুই না এলাহাবাদে পরীক্ষা..."

ল্যারিরূপী প্রতীককে ইনস্পেক্টরের দিকে ঠেলে দিয়ে দাড়ি-গোঁফ এবং চুলের বোঝা সরিয়ে বাপ্পা বলল, "এ ছাড়া উপায় ছিল না।"

এ বারে জলদগম্ভীর স্বরে ল্যারিরূপী প্রতীক বলল, "আমাকে আপনারা এ ভাবে গ্রেফতার করতে পারেন না। আমি কোনও অন্যায় করিনি। চুরির তো প্রশ্নই উঠছে না।"

বাপ্পা খানিক ক্ষণ স্থির ভাবে প্রতীকের দিকে তাকিয়ে রইল। তার পরে বলল, "উঠছে।"

{৫}

ওরা এখন অভ্রদের বাড়িতে জলখাবার সেরে কফি নিয়ে বসেছে।

নীল জিজ্ঞেস করল, "প্রতীকের সঙ্গে মলয়ের হাত মেলানোটা কবে হল?"

বাপ্পা হেসে বলল, "প্রতীক আগের বার এসেই যা জানার জেনে নিয়েছিল। গাড়ি বিক্রির খবর অতএব তার কাছে থাকারই কথা। আর চুরির জন্য তাকে প্রায় কোনও পরিশ্রমই করতে হয়নি। কারণ তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল মলয়।"

"কিন্তু গাড়িটা এত দিন কোথায় ছিল?" শাক্য জানতে চায়।

"পান্থলালবাবুর আস্তানায়। সুযোগ হচ্ছিল না বলে সরাতে পারেনি।"

"কী আশ্চর্য! ওখানে?"

"ইয়েস! পান্থলালের বাড়িটা তোরা ভাল করে দেখিসনি। ভিতরে অনেকটা জায়গা থাকার কথা। অন্যথায় এই রিস্ক প্রতীক নিত না। তোরা যাওয়ার পরে পান্থবাবু বুঝতে পারেন যে, এ বারে বিপদ বাড়তে পারে। তাই কাল রাতেই ছেলেকে গাড়ি নিয়ে চলে যেতে বলেন।"

"সহদেববাবু কি জীবনলালের কাছ থেকে গাড়িটা কেনেন?" অভ্র জানতে চায়।

"এগজ্যাক্টলি! এখানে অবশ্য আমার অনুমান আর জগন্ময়বাবুর সাহায্য মিশে আছে।"

"কী রকম?"

"পিটার ভ্যান হেডেনের গাড়িটার দু'জন সম্ভাব্য ক্রেতা ছিল। সহদেব জীবনলালের কাছে দরে হেরে যান। কিন্তু গাড়ির প্রতি লোভটা ছাড়তে পারেননি। জীবনলালের হঠাৎ মারা যাওয়ার পিছনে তাঁর ভূমিকা ছিল কি না, সেটাও রহস্য!"

"তার মানে?" শাক্য জিজ্ঞেস করে।

"ডাচ সাহেবের সেক্রেটারির বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলেন সহদেব এবং জীবনলাল। পরের দিন সকালে জীবনলালকে সহদেবের প্রান্তিকের বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সেক্রেটারিকে অবশ্য তার পর থেকে আর দেখা যায়নি।"

নীল বলে ওঠে, "এ যে অবিশ্বাস্য! জীবনলাল কি তখন ঝিমনাগড়ে থাকতেন না?"

বাপ্পা উত্তরে জানায়, "জীবনলালের বাড়ি ছিল পটনায়। ব্যবসার কারণে প্রান্তিকে আসায় গাড়ি বিক্রির কথাটা জানতে পারেন। একটা সপ্তাহ সাহেবের ওখানেই থেকে যান। সহদেব তাঁর সঙ্গে হয়তো বন্ধুতার ভান করে থাকবেন। জীবনলালকে নতুন কেনা বাড়িতে থাকার নেমন্তন্ন হয়তো তিনিই করেছিলেন। এর অনেক বছর বাদে পান্থলাল ঝিমনাগড়ে থাকতে আসেন। জীবনলালের মারা যাওয়া এবং গাড়ি কেনা নিয়ে কিছু না-কিছু খবর ইতোমধ্যে তাঁর কাছে পৌঁছেছিল। গাড়িটি উনি দেখেওছিলেন। কিন্তু সে গাড়ি যে আসলে তাঁদেরই সম্পত্তি, এটা প্রমাণ করার তখন উপায় কোথায়? ফলে চোখের সামনে গাড়িটা দেখেও তাদের কিছু করার ছিল না।"

"তুই এত কিছু কী ভাবে জানলি?" এটা শাক্যর প্রশ্ন। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করেছেন জগন্ময় সেনশর্মা। তাঁর দিকে তাকিয়ে বাপ্পা বলল, "ইনিই আমাকে হেল্প

করেছেন।”

“কিন্তু কী ভাবে?” অভ্র জিজ্ঞেস করল।

জগন্ময়বাবু বললেন, “গত বার তোমার বাবা যে দিন এখান থেকে বেঙ্গালুরুতে ফিরে যান তার আগে ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ বাড়ির ধসে যাওয়া দেওয়াল-আলমারি থেকে পুরনো বইপত্তর লাইব্রেরির জন্য নিতে পারি কিনা। উনি অনুমতি দিয়েছিলেন। কিছু দিন পরে মলয়কে জানিয়ে কিছু বই লাইব্রেরিতে নিয়ে রাখি। তখনই একটি অতি পুরনো খাতা আমার চোখে পড়ে, যার খবর বোধ হয় কেউই জানত না। সহদেবের বিক্ষিপ্ত রোজনামচা বলতে পারো। সে সব পড়ার পরে সঙ্কোচে এখনও কাউকে বলতে পারিনি। উনি যে শেষ জীবনে রিপেন্ট করেছিলেন, বুঝতে অসুবিধে নেই। আর গাড়িটা অবশ্য ছেলেবেলা থেকে এই বাড়ির গ্যারাজেই দেখে আসছি।”

বাপ্পা বলল, “গাড়ি চুরি যাওয়ার দিনই জগন্ময়বাবু অনুরূপ বক্সীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এলাহাবাদের ট্রেন ধরার জন্য হাওড়া যাচ্ছিলাম। মাঝ রাস্তায় মিস্টার বক্সীর ফোন পাই। সেখান থেকে জগন্ময়বাবুর সঙ্গেও যোগাযোগ হয়। উনি অনুরোধ করেন যেন আমি কেসটা টেক-আপ করি। কিন্তু নিজের পরিচয়ে যেন না আসি। ফলে দিগ্বিজয়ের আবির্ভাব! সরেজমিনে সবটুকু না দেখলে কি আর কাজ মিটত?”

“আর এসএমএস-টা কে পাঠাল?” শাক্য জিজ্ঞেস করল।

“ইনস্পেক্টর দত্তকে আমিই মেসেজটা পাঠাতে বলেছিলাম।”

“প্রতীক কি তবে আগের বার যায়নি?”

“গিয়েছিল। কিন্তু অভ্র যে এখানে আসবে এটা মলয়ের কাছে জানতে পেরে প্রতীক তার আগেই এখানে ফিরে আসে। খবর নিয়ে জেনেছি, তার আর্থিক টানাটানি চলেছে। অতিমারির পরে ট্র্যাভেল এজেন্সির বিজ়নেস লাটে উঠলে অবাক হব না। সুতরাং গাড়ি বিক্রি হতে পারে জানার পরে প্রতীকের মনে হয়ে থাকবে,আর দেরি করা চলে না। তা ছাড়া নিজের পূর্বপুরুষের কেনা গাড়ির উপরে কিছু জোর তো থাকে!”

খানিক বাদে নীল জানতে চায়, “পিটারের ওয়াইফের আঁকা ছবিগুলোর কী হল?”

বাপ্পা অভ্রদীপকে জিজ্ঞেস করল, “এক বার গ্যারাজে যাওয়া যাবে?”

“অফ কোর্স!”

অভ্র এবং বাকিরা কিছু ক্ষণের মধ্যে গ্যারাজে রাখা গাড়িটার কাছে উপস্থিত হওয়ার পরে ড্রাইভারের পাশের সিটের নীচের দিকে একটি জায়গা টেনে তুলে আঙুলের চাপ দিয়ে সিটের ভিতরটা খুলে ফেলে বলল, "কাল রাতেই অবশ্য এখানে পার্কিংয়ের সময় ব্যাপারটা দেখে নিয়েছিলাম।"

সকলেই অবাক হয়ে দেখলেন, একটি বর্গাকার বড় খসখসে কাগজের প্যাকেট সযত্নে সেখানে রাখা আছে। বাপ্পা সেটি তুলে নিয়ে প্যাকেটটা খুলতেই মোটা কাগজে আঁকা ছ'টি অসামান্য সুন্দর তৈলচিত্র বেরিয়ে এল।

"এই ছবিগুলোর দাম আজকের দিনে নেহাত কম হবে না," জগন্ময়বাবু বললেন।

"অফ কোর্স! পিটারের অ-খেয়ালের সুযোগ নিয়ে এগুলোও চুরি করেন সহদেব। গত কাল প্রতীকবাবু বলেছিলেন যে, তাঁকে গ্রেফতারের কোনও অর্থ নেই। কারণ, চুরির প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এটি অর্ধ-সত্য। গাড়িটা হয়তো তাঁর পূর্ব-পুরুষেরই ছিল। নিজের বংশের গাড়ির উপরে ন্যায্য অধিকার আছে—তিনি বলতেই পারেন। যদিও যেটা করেছিলেন সেটা এক প্রকার চুরিই বটে। তবে এর বাইরেও অপরাধ আছে। গাড়ির সঙ্গে ছবিগুলিও নিয়ে যাচ্ছিলেন। ওগুলো তো জীবনলালের নয়। সর্বোপরি আমার দুই বন্ধুর দিকে গুলি ছোড়া! অ্যাটেম্পট টু মার্ডার বললে ভুল হবে কি?"

অভ্রদীপ এ বারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।

প্রায় মিনিট দুয়েক বাদে নীল বলল, "বাকি রইল একটি রহস্য। আপন সখা বলে সহদেব আসলে কী বলতে চেয়েছিলেন?"

"ওহ নীল! তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। সব কিছু দেখেও যদি না বুঝিস!"

নীল খানিক অপ্রস্তুত হয়ে বলে, "তার মানে?"

বাপ্পা গাড়ির সামনে গিয়ে ওকে এবং অন্যদের ডেকে দেখায়, "নম্বর প্লেটটা খেয়াল করা জরুরি। এএএস- ওয়ান সেভেন নাইন থ্রি! সহদেব লিখেছিলেন, আমার আপন সখা। অর্থাৎ এএএস। আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মানে হল নম্বর প্লেটটা বদলে ফেলা যাতে জীবনলালের গাড়ির সঙ্গে মেলানো না যায়। লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছিল ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে। নতুন নম্বরটা তাই-ই। উনি ওইটুকু হেঁয়ালি করেছিলেন।"

“ব্রিলিয়ান্ট বাপ্পাদিত্যবাবু!” খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন জগন্ময় সেনশর্মা।

অভ্রদীপ এগিয়ে এসে বাপ্পার হাত দু’টি ধরে বলে, “তুই একটা জিনিয়াস রে! তুই আমাদের বন্ধু, এটা ভেবে ভীষণই গর্ব বোধ করছি।”

গল্প পাঠানোর নিয়মাবলি

▶ আনন্দমেলায় গল্প পাঠাতে হবে ডাকে কিংবা ইমেলে। পত্রিকা দফতরের রিসেপশনে এসেও গল্প জমা দিতে পারেন।

▶ ডাকে কিংবা দফতরে জমা দিলে গল্পটি হাতে লিখে কিংবা কম্পিউটারে কম্পোজ় করে প্রিন্ট আউট নিয়েও পাঠাতে পারেন। তবে লেখাটি মনোনীত হলে তখন কিন্তু ইউনিকোডে কম্পোজ় করা সফ্‌ট কপি পাঠাতে হবে। ইমেলে পাঠালে কিন্তু গল্পটিকে প্রথমেই ইউনিকোডে কম্পোজ় করেই পাঠাতে হবে।

▶ গল্পের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা, মোবাইল/ ফোন নম্বর পাঠানো বাধ্যতামূলক।

▶ গল্পের শব্দসংখ্যা ২০০০-এর মধ্যে রাখাই ভাল।

▶ গল্পটি যেন মৌলিক হয়। অন্য কোনও গল্পের অনুবাদ কিংবা অনুসরণ কিংবা অনুকরণ হলেও চলবে না। এবং কোথাও যেন গল্পটি প্রকাশিত না হয়ে থাকে।

▶ ডাকযোগে গল্প পাঠানোর ঠিকানা: সম্পাদক, আনন্দমেলা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১।

▶ গল্প পাঠানোর ইমেল হল: anandamela@abpmail.com

ছবি: বৈশালী সরকার

রহস্যে যখন রবীন্দ্রনাথ

ঝুলনের কপাল কুঁচকে গেছে। চন্দ্রনাথ গড়গড়ির ঘরময় চরকি পাক খাচ্ছে সে তখন। সেকেলে ঘর। ঘরের মধ্যে মস্ত পালঙ্ক। দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের একটি পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র। পুরনো আমলের মেহগনি কাঠের তালাবন্ধ দেরাজ। বসার জন্যে দুটো সিঙ্গল সোফা, একটা ইজিচেয়ার।

জয়দীপ চক্রবর্তী

গরমের ছুটি এগিয়ে আসায় স্কুলে ছুটি হয়ে গেছে। নোটনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তবু উঠতে ইচ্ছে করছিল না। মা এর আগে এক বার এসে ডেকে গিয়েছিলেন। এই বার রুদ্র মূর্তিতে ঘরে ঢুকে রীতিমতো শাসানি দিলেন, "দ্যাখ নোটন, তিন মিনিটের মধ্যে বিছানা ছেড়ে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে যদি পড়তে না বসিস, আমি কিন্তু একেবারে কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে ছাড়ব বলে দিলুম।"

অগত্যা বিছানা থেকে নেমে লম্বা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল নোটন। আর তখনই পর পর তিন বার ডিং ডং শব্দে কলিং বেল বেজে উঠল।

এক সঙ্গে তিন বার ডোর বেল বাজা মানে নির্ঘাত ঝুলনদি এসেছে। আর ঝুলনদি যখন এই সাতসকালে তাদের বাড়ি এসে হাজির হয়েছে, অবশ্যই একটা কিছু গল্প আছে। এক মুহূর্তও দেরি না-করে দ্রুত তৈরি হয়ে বাইরের ঘরে এল নোটন। ঝুলন আড় চোখে এক বার তার দিকে তাকিয়ে নিল। তার পরেই আহ্লাদে যেন গলে পড়ল একেবারে, "নোটনকে নিয়ে এক জায়গা থেকে ঘুরে আসি কাকিমা? প্লিজ় না কোরো না। জানোই তো, ও সঙ্গে থাকলে আমি একটু বাড়তি ভরসা পাই।"

"তা যাওয়াটা হচ্ছে কোথায় শুনি?"

"সাউথ গড়িয়া।"
"সেটা কোথায়?"
"চম্পাহাটির কাছে।"
"তোদের দু'জনের হঠাৎ সেখানে যাওয়ার কী দরকার পড়ল?"

চোখের ইশারায় নোটনকে দ্রুত খাওয়া শেষ করতে বলল ঝুলন। তার পর মুখটাকে যথা সম্ভব দুঃখী দুঃখী করে বলল, "আমার বন্ধু অদিতির দাদুকে কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। খুব ভেঙে পড়েছে বেচারি। এ সময় ওর পাশে গিয়ে না-দাঁড়ালে ভাল দেখায়, বলো?"

"পাওয়া যাচ্ছে না মানে?" নোটনের মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তিনি তো আর ছেলেমানুষ নন যে ছেলেধরায় ধরবে! ভদ্রলোকের অ্যালজ়াইমার্স আছে নাকি?"

"উঁহু," দু'দিকে মাথা নাড়াল ঝুলন।

"কিডন্যাপ? টাকাপয়সা চেয়ে ফোন এসে গেছে?"
"ধুস।"

“তা হলে?”
“ব্যাপারটা ঠিক কী, এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। ওরা আপাতত আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে খোঁজটোজ নিচ্ছে।”

“অত বড় মানুষ যদি স্বেচ্ছায় নিখোঁজ হয়ে যান বা কেউ তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়, তা হলে তাঁকে খুঁজে বের করা তো পুলিশের কাজ। তোরা বাপু আবার এ সবের মধ্যে জড়িয়ে হুজ্জুতি বাধাতে যাস না।”

“আচ্ছা,” বাধ্য মেয়ের মতো এক দিকে ঘাড় কাত করল ঝুলন। তার পর নোটনের দিকে চেয়ে বলল, “রেডি?”
“হুঁ।”
“চল।”

বাইরে ঝুলনদির লাল রঙের স্কুটিতে দুটো হেলমেট ঝোলানো ছিল। ঝুলনদির চোখের ইশারায় তার একটা নিজের মাথায় গলিয়ে নিল নোটন। স্কুটিতে স্টার্ট দিয়েই এক বার মুচকি হাসল ঝুলন, “কাকিমাকে ম্যানেজ করে আমিই তোকে বের করে নিয়ে এলাম, এ কথাটা মাথায় রেখে দিস। নইলে হাঁদা গঙ্গারামের মতো বাড়িতেই বসে থাকতে হত তোকে।”

“মাস্টার্সে দুরন্ত রেজাল্ট করার পর থেকে উঠতে-বসতে আমার সামনে মা- বাবা তো তোমার উদাহরণই তুলে ধরেন। তোমার কথা মা ফেলবে কেমন করে...”

“ও সব ছেঁদো প্রশংসায় কাজ হবে না চাঁদু,” স্কুটি চালাতে চালাতেই নোটনকে থামিয়ে দিল ঝুলন, “এক দিন ভাল রেস্তরাঁয় নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিস আমাকে।”

(২)

স্কুটিতে অদিতিদির বাড়িতে পৌঁছোতে মিনিট কুড়ি সময় লাগল। পুরনো আমলের বনেদি বাড়ি। যদিও বাড়ির অনেক জায়গাতেই অযত্নের ছাপ স্পষ্ট। পলেস্তারা খসে পড়েছে। রংও হয়নি বহু কাল।

সদর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই এক জন মাঝ বয়সি মানুষ এগিয়ে এলেন। ঝুলনদের দিকে চেয়ে নিচু গলায় বললেন, “আপনিই বুঝি ঝুলনদিদি? দিদিভাই আপনার কথা বলে রেখেছেন আমায়। আসুন, ঘরে আসুন।”

“তুমি তো দাশুকাকা?” ঝুলন মিষ্টি করে হাসল, “তোমার গল্প অদিতির কাছে খুব শুনি।”

“সে তো শুনবেই,” দাশুকাকা হাসে, “আমার কোলে-পিঠেই তো মানুষ।”

দাশুকাকা ঝুলন আর নোটনকে বাইরের ঘরে এনে বসাল। ঘরে চেয়ার এবং সোফা পাতা। দেওয়ালে তিনটে অয়েল পেন্টিং। ঝুলনদের সে দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে দাশুকাকা বলল, “বড়বাবুর মা, বাবা আর ঠাকুরদাদা।”

“আচ্ছা,” ঝুলন চোখ গোল গোল করে বলল, “তুমি এঁদের দেখেছ দাশুকাকা?”

“বড়বাবুর মা-বাবাকে দেখেছি,” দাশুকাকা ম্লান হাসল, “সেই ছেলেবেলা থেকে বড়বাবুর ছায়াসঙ্গী হয়ে তাঁর ফাইফরমাশ খাটছি। মানুষটা দুম করে কোথায় যে চলে গেলেন...” দাশুকাকার গলা বুজে এল।

“দাদু কোথায় যেতে পারে বলো তো?”

“কী জানি, কিছুই তো মাথায় ঢুকছে না দিদি।”

“তুমি তো তাঁর ছায়াসঙ্গী ছিলে বলছ। কিচ্ছু আঁচ পাওনি?”

“উঁহু,” দাশুকাকা দু’দিকে মাথা নাড়ল, “পঁচিশে বৈশাখ এ বাড়িতে ঘটা করে রবি ঠাকুরের জন্মদিন পালন হয় ফি বছর। আজ থেকে নয়, বড়বাবুর বাবার আমল থেকেই। পাড়া ঝেঁটিয়ে লোকজন আসে সে দিন। কেউ গায়, কেউ নাচে, কেউ বা আবার কবিতা বলে। এ বারেও এসেছিল। সে দিন ছোটবাবুর সঙ্গে আর-এক জন ভদ্রলোক এসেছিলেন শহর থেকে। বড়বাবুর সঙ্গে অনেক ক্ষণ কী নিয়ে কথা হল তাঁর। বড়বাবুকে খুবই অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছিল। ভদ্রলোক চলে যেতেই ছোটবাবুকে ঘরে ডেকে খুব চেঁচামেচি করলেন খানিক।”

“সেই ভদ্রলোকের নাম জানো?”

“নাম?” দাশুকাকা একটু ভাবল, “ছোটবাবুর সঙ্গে চেঁচামেচির সময় বার দুই বড়বাবু ভার্গব মিত্র নামটা উচ্চারণ করেছিলেন।”

“আচ্ছা,” ঝুলন মাথা নাড়িয়ে বলল, “আর কিছু?”

“তার পর এক দিন রাতে বড়বাবুর ঘরে চোর ঢোকার চেষ্টা করল।”

“সে কী! কবে?” ঝুলন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

“এই তো ক’দিন আগে,” দাশুকাকা বলল, “বড়বাবুর ঘরে ঢুকেই পড়েছিল। মুখে মাস্ক ছিল বলে বড়বাবু বোধ হয় লোকটাকে চিনতে পারেননি।”

“কিছু নিতে পেরেছিল?” নোটন জিজ্ঞেস করল।

“উঁহু, বাবু ‘কে, কে’ করে হেঁকে উঠতেই সে পালিয়ে যায়। আমরা হাঁক-ডাক শুনে বাবুর ঘরে এসে দেখি সব ভোঁ ভাঁ।”

“রাতে সদর দরজা তো বন্ধ থাকে ভিতর থেকে। চোর ঢুকল কী করে?” ঝুলনের ভ্রু কুঁচকে উঠেছে।

“কী যে বলো দিদি,” দাশুকাকা হাসল, “একশো বছরের পুরনো দরজা। ও দরজা কি আর এখন সিধে আছে যে, বন্ধ হবে? ওই কোনও রকমে ভেজিয়ে রাখা থাকে রাতের বেলা। এখানে চুরি-ডাকাতি হয় না বলে বড়বাবু নিজেই তো ঘরের দরজা খুলে ঘুমোন। দরজা বন্ধ করলে তাঁর নাকি দম বন্ধ হয়ে আসে।”

“আচ্ছা,” ঝুলনের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠছে ক্রমাগত।

“সে রাতের পর থেকেই বড়বাবু কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। কারও সঙ্গে কথা বলতেন না,” দাশুকাকা আফসোসের সুরে বললেন, “সারা দিন নিজের ঘরের ইজিচেয়ারটায় শুয়ে খালি গান শুনতেন।”

“গান শুনতেন?”

“হ্যাঁ গো ঝুলনদিদি,” বলে হাতের চেটো দিয়ে নিজের চোখ মুছল দাশুকাকা, “মানুষটাকে দেখলে কী যে কষ্ট লাগত। অমন হাসি-খুশি মানুষ...

দাশুকাকার কথার মাঝখানেই অদিতি ঘরে এসে ঢুকল, “এসে গেছিস তোরা? আয় ভিতরের ঘরে গিয়ে বসি।”

অদিতির মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যাচ্ছে প্রচুর কান্নাকাটি করেছে। ঝুলন এগিয়ে গিয়ে তার পিঠে হাত রাখতেই অদিতি আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, “দাদুই আমার সবচেয়ে

কাছের বন্ধু ছিল। সেই মানুষটা এখন কোথায় কী ভাবে আছে...”

ঝুলন তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল, “এখন ভেঙে পড়লে চলবে না দিতি। মাথা ঠান্ডা রাখ। আমার ধারণা, পথ একটা বেরোবেই।”

“যদি এর মধ্যেই তাঁর অন্য কোনও বিপদ ঘটে যায়, রোড অ্যাক্সিডেন্ট বা আরও খারাপ কিছু?” অদিতির চোখে জল এল আবার।

“আমার মনে হয় এক্ষুনি অতটা দুর্ভাবনা করার সময় আসেনি,” ঝুলন বলল, “আমি অলরেডি থানায় শুভঙ্করদাকে বলে রেখেছি সব। শুভঙ্করদার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী কাল সকাল থেকে আজ ভোর ছ'টা পর্যন্ত কোনও আনআইডেন্টিফায়েড বডি মর্গে আসেনি এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত কোনও রোগী ভর্তি হননি আশপাশের হাসপাতালগুলোয়।”

“দাদুকে তা হলে খুঁজে পাওয়া যাবে, বল?” অদিতি যেন একটু আশ্বস্ত হল।

“আশা করছি,” ঝুলন হাসল, “চল, দাদুর ঘরটা বরং ঘুরে দেখে আসি এক বার।”

ওদের নিয়ে ভিতর-বাড়িতে ঢুকল অদিতি। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে ডান দিকের প্রথম ঘরটাই চন্দ্রনাথ গড়গড়ির। সে ঘরে ঢুকে অদিতি বলল, “এই আমার দাদুর ঘর। কী দেখবি দেখে নে নিজের চোখে।”

ঝুলন হাসল, “দেখব তো বটেই। কিন্তু তার আগে কতগুলো কথা জেনে নেওয়া দরকার।”

“কী?”

ঝুলন কিছু বলার আগেই অদিতির মা থালায় করে মিষ্টি নিয়ে এলেন, “ও মা ঝুলন, কত্ত বড় হয়ে গেছিস তুই? দিতির মুখে তোর কত গল্প শুনি। তুই নাকি বিখ্যাত হয়ে গেছিস?”

“ধুস,” লজ্জা পেয়ে যায় ঝুলন।

“এই বুঝি নোটন?” নোটনের থুতনিতে হাত দিয়ে চুমু খেলেন তিনি, “তোমাদের সাহসের কথা শুনেছি। কিন্তু এমন সময় আমাদের বাড়ি এলে তোমরা, বসে যে সে সব গল্প শুনব, সে উপায় নেই। শুনেছ তো সব। জলজ্যান্ত মানুষটা কাল ভোর থেকে নিখোঁজ হয়ে গেলেন। আমাদের মনের মধ্যে কী অশান্তি যে চলছে, কী বলব।”

তাঁর হাত থেকে মিষ্টির থালাটা নিয়ে ঝুলন টেবিলে রাখল। তার পর অদিতির মায়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "কাল কখন জানতে পারলেন দাদু নিখোঁজ?"

"রোজ ভোরবেলায় আমরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই উনি হাঁটতে বেরোন। কালও বেরিয়েছিলেন। সাধারণত সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ তিনি ফিরে আসেন। মাঝে-মধ্যে অবিশ্যি দেরি করেন না এমন নয়। পাড়া-প্রতিবেশী কারও বাড়িতে হয়তো চা খেতে ঢুকে পড়লেন অনুরোধ এড়াতে না-পেরে। ওঁকে সকলেই তো মান্যি করে, ভালওবাসে। কিন্তু তেমনটা হলে সব সময়েই তিনি ফোন করে জানিয়ে দিতেন।"

"কাল ফোন করেননি?"

"না," অদিতির মা আলপনা বললেন, "আটটা বেজে যাওয়ার পরেও যখন ফিরছেন না, আমরাই ফোন করি এবং বুঝতে পারি, তাঁর ফোন ঘরেই পড়ে রয়েছে। তার পর থেকেই চার দিকে খোঁজাখুঁজি চলছে। আত্মীয়দের বাড়িতেও ফোন করে খবর নিচ্ছি।"

"কোথাও যাননি?"

"উঁহু।"

"আশ্চর্য!" ঝুলন বলল, "পুলিশে খবর দিয়েছেন? মিসিং ডায়েরি টায়েরি..."

"না, এখনও করা হয়নি", আলপনা দু'দিকে মাথা নাড়লেন, "আসলে এর আগে এক বার অমন হুট করে কাউকে না-জানিয়ে শান্তিনিকেতন চলে গিয়েছিলেন তিন দিনের জন্যে। খেয়ালি মানুষ। এ বারেও হয়তো..."

"আচ্ছা এই বাড়িতে ক'দিন আগে নাকি রাতে চোর ঢুকেছিল?" আলপনার কথার মাঝখানেই জিজ্ঞেস করে নোটন।

"আমরা দেখিনি। উনিই রাতের বেলা চেঁচামেচি করে বলছিলেন। পরে অবিশ্যি এ বিষয়ে আর কিছু বলেননি।"

ঝুলনের কপাল কুঁচকে গেছে। চন্দ্রনাথ গড়গড়ির ঘরময় চরকি পাক খাচ্ছে সে তখন। সেকেলে ঘর। ঘরের মধ্যে মস্ত পালঙ্ক। দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের একটি পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র। পুরনো আমলের মেহগনি কাঠের তালাবন্ধ দেরাজ। বসার জন্যে দুটো সিঙ্গল সোফা, একটা ইজিচেয়ার। দেওয়াল আলমারিতে রবীন্দ্র রচনাবলি সহ আরও কিছু বই

আর টুকিটাকি জিনিসপত্র, ওষুধ। ঘরের এক প্রান্তে একটা টেবিল। সেখানে কয়েকটা ডায়েরি, রাইটিং প্যাড, কলমদানি আর রবীন্দ্রনাথের ‘গীতবিতান’। ঝুলন প্রত্যেকটা জিনিস খুঁটিয়ে দেখছিল।

নোটন জিজ্ঞেস করল, “অদিতিদি, এই ঘরে কি এমন কিছু দামি জিনিস আছে, যা চুরি করার জন্যে কেউ এই ঘরে ঢোকার চেষ্টা করতে পারে?”

অদিতি একটু ক্ষণ চুপ করে থাকল। তার পর বলল, “একটাই জিনিস আছে। এক অর্থে সে বস্তুটার কোনও দাম নেই। নিছক একটা পুরনো হলদে হয়ে যাওয়া কাগজের টুকরো বই কিছু নয়। কিন্তু কারও কাছে আবার সেই জিনিসটিই অমূল্য। যেমন আমি আর আমার দাদু মনে করি, এ আমাদের সাত রাজার ধন এক মাণিক। আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়...”

“কী জিনিস রে? আগে বলিসনি তো কখনও!” ঝুলন গল্পের গন্ধে অদিতির পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

“রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাক্ষর সহ তাঁর অপ্রকাশিত কবিতার পাণ্ডুলিপি।”

“অ্যাঁ?” ঝুলন, নোটন দু’জনেরই চোখ গোল গোল হয়ে উঠেছে শুনে, “তোরা এ জিনিস পেলি কোথায়?”

“তোমরা জানো তো, উনিশশো তিরিশ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ় সাহেবের সঙ্গে বাসন্তী হয়ে গোসাবা গিয়েছিলেন?” অদিতির বাবা শঙ্খকাকু এত ক্ষণে এই ঘরে ঢুকেছেন। ঝুলনের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, “বাসন্তী থেকে ফেরার সময় চম্পাহাটি রেল স্টেশনে এই অঞ্চলের মানুষ তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। আমার ঠাকুরদা, লেট আদিনাথ গড়গড়ি সেই আয়োজনে অংশ নিয়েছিলেন। তখন তাঁর নিতান্তই বালক বয়স। সই সংগ্রহের জন্য আমার পিতামহ কবিগুরুর দিকে তাঁর স্কুলের খাতা বাড়িয়ে দিতে, স্নেহপরবশ হয়ে তিনি সেই বালকের খাতায় আশীর্বাণী হিসেবে একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। সেই কাগজটি পরে আমার বাবার কাছে আসে। আমার বাবা যাকে বলে একেবারে রবীন্দ্রনাথ অন্ত প্রাণ। ওই টুকরো কাগজটা তাঁর কাছে হিরের চেয়েও দামি,” বলে হেসে ফেললেন তিনি।

“দাশুকাকা বলছিল, ক’দিন ধরে তিনি নাকি সারা দিন ঘরের মধ্যেই থাকছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের গান শুনে কাটাচ্ছিলেন?” ঝুলন হঠাৎই প্রসঙ্গ পাল্টাল।

“আশ্চর্য একটা ব্যাপার জানিস তো ঝুলন,” অদিতি বলল, “দাদু এই ক’দিন নির্দিষ্ট কয়েকটা গানই শুনে গেছে সারা ক্ষণ। আমাকে এক দিন কাছে ডেকে একটা কাগজ আর নিজের সেলফোনটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, দিদি, এই গান ক’টি আমার ফোনে ভরে দাও দেখি।”

“দিলি?”

“হ্যাঁ,” অদিতি মাথা নাড়ল, “তার পর থেকেই দাদু ওই গানগুলো একটা নির্দিষ্ট ক্রমে সারা দিন শুনে যেত। এমনকি আমাকেও ডেকে বসিয়ে শোনাত। বার বার। আমি এক গান বার বার শুনতে বিরক্ত হতাম। তখন হেসে বলত, আমি যখন থাকব না, এই গানের মধ্যেই আমাকে খুঁজে পাবে তুমি।”

“ইন্টারেস্টিং,” ঝুলন উত্তেজিত হয়ে বলে, “ক্রমটা মনে আছে?”

“যত দূর মনে পড়ছে, যে তালিকাটা দাদু আমাকে দিয়েছিল, সেই তালিকা অনুযায়ীই পর পর গানগুলো চলত...”

“সেই গানের তালিকাটা আমাকে দিতে পারিস?” গম্ভীর মুখে অদিতিকে বলল ঝুলন।

“দাঁড়া দেখছি,” বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অদিতি।

“আচ্ছা কাকু,” অদিতি শঙ্খনাথের দিকে চাইল, “আপনার সঙ্গে কিছু দিন আগে দাদুর কী নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল বলুন তো?”

“তোমাকে কে বলল?” স্থির চোখে ঝুলনের দিকে চেয়ে বললেন শঙ্খনাথ।

ঝুলন সে কথার উত্তর না-দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, “ভার্গব মিত্র কে?”

“আমার পরিচিত এক জন।”

“তিনি এ বাড়িতে দাদুর কাছে কী প্রয়োজনে এসেছিলেন?”

“তুমি কি আমাকে জেরা করছ ঝুলন?” শঙ্খনাথের গলায় স্পষ্টতই বিরক্তি।

“না না কাকু,” ঝুলন ন্যাকা ন্যাকা গলায় বলল, “ভার্গব মিত্র নামটা আমার যেন খুব চেনা লাগছে, তাই...”

“উনি এক জন সংগ্রাহক...”

“ঠিক,” ঝুলন বলল, “কলকাতায় স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরের উপরে একটা প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে ভদ্রলোকের কালেকশন দেখেছি। দুর্দান্ত। তা হলে তিনি কি রবীন্দ্রনাথের ওই পাণ্ডুলিপিটি...”

“দেখতে এসেছিলেন,” ঝুলনকে কথা শেষ করতে না-দিয়েই বললেন শঙ্খনাথ, “তুমি কি এই ঘটনার সঙ্গে আমার বাড়ির চুরি বা বাবার নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনাকে রিলেট করতে চাইছ নাকি?”

“আমি কিছুই চাইছি না কাকু,” ঝুলন হাসল, “এমনিই কৌতূহল হচ্ছিল ভদ্রলোককে নিয়ে, তাই। এঁরা কিন্তু অনেক সময়েই অ্যাট এনি কস্ট, এই ধরনের দুষ্প্রাপ্য বস্তু নিজের দখলে আনতে চান...”

অদিতি আবার ঘরে এসে ঢুকল।

একটা কাগজের টুকরো বাড়িয়ে দিল ঝুলনের দিকে।

ঝুলন আগ্রহের সঙ্গে কাগজটা হাতে নিয়ে দেখল, সেখানে চন্দ্রনাথ স্পষ্ট হস্তাক্ষরে পর পর পাঁচটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম পংক্তি লিখে রেখেছেন।

“আমি কারে ডাকি গো...”
“কাছে ছিলে দূরে গেলে...”
“শরত-আলোর কমলবনে...”
“প্রভু আমার প্রিয় আমার...”
“দীপ নিবে গেছে মম...”

ঝুলন এক দৃষ্টিতে কিছু ক্ষণ তাকিয়ে রইল কাগজটার দিকে। গানের প্রথম পঙ্‌ক্তিগুলো বার বার পড়তে লাগল। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। চন্দ্রনাথের টেবিল থেকে ‘গীতবিতান’ বইটি হাতে তুলে নিয়ে আনমনে তার পাতা ওল্টাতে শুরু করল ঝুলন। এক জায়গায় এসে থেমে গেল। বইয়ের মধ্যে থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলে মেলে ধরল চোখের সামনে। একটা চিঠি। বছর পাঁচেক আগের। তাঁর নীলু নামের কোনও বন্ধুর লেখা। ঝুলন তার ফোনে চিঠিটার একটা ফটো তুলে নিল। তার পর আবার চিঠিটা রেখে দিল বইয়ের মধ্যে।

অদিতি জিজ্ঞেস করল, "কিছু বুঝলি?"

"একটু সময় দে আমাকে," ঝুলন বলল।

নোটনের বাড়ির কাছাকাছি এসে তাকে নামিয়ে দিল ঝুলন। বলল, "তুই বাড়ি চলে যা। আমি কয়েক জায়গায় ঘুরে সন্ধের পর আসব তোদের বাড়ি। তখন কথা হবে।
উত্তর পাবে না জেনেই, ঝুলন কোথায় যাবে সে বিষয়ে প্রশ্ন করল না নোটন। সন্ধের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

ঝুলন যখন এল, ঘড়িতে তখন রাত প্রায় দশটা। মাঝে বার তিনেক ফোন করেছিল নোটন। ঝুলন ফোন ধরেনি। ঘরে ঢুকতেই এক রাশ কৌতূহল নিয়ে নোটন জিজ্ঞেস করল, "কিছু জানতে পারলে?"

"হুঁ," ঝুলনকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। নোটনের দিকে ফিরে বলল, "চন্দ্রনাথ গড়গড়ি বিপদের মধ্যে নেই, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তিনি স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়েছেন। এমনকি চন্দ্রনাথদাদুর ঘরে কোন চোর ঢুকেছিল, সেটাও এখন অনেকটাই পরিষ্কার। শুধু তিনি যে কোথায় আছেন এখন..."

"কী করে জানবে?"

"তাঁর কথা অনুযায়ী, গানের মধ্যেই তাঁকে খুঁজে পাওয়া উচিত। কিন্তু ওইখানেই তো মুশকিলে পড়ে গেছি রে নোটন। পাঁচটা গানের দুটো পুজো পর্যায়, একটা প্রেম, একটা প্রকৃতি আর একটা নৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা' থেকে নেওয়া। মুশকিল হল, কোনও গান থেকেই তো তাঁর অন্তর্ধানের কোনও সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না রে। কত বার যে গানগুলো পুরোটা পড়লাম সকাল থেকে..." ঝুলনের মুখে অসহায়তা ফুটল, "রাতে তুইও ভাব দেখি জম্পেশ করে। এখন আমি বাড়ি যাই। কাল আবার কথা হবে।"

"আচ্ছা ঝুলনদি, দাদুর ঘরে যে চিঠিটা ছিল, সেখানেও তো কিছু সূত্র থাকতে পারে?"

"মামুলি চিঠি। তেমন কিছু নয়," বলেও অদিতিকে ফোন করল ঝুলন, "নীলু নামে দাদুর কোনও বন্ধুকে জানিস?"

"দাদুর কাছে নাম শুনেছি বোধ হয়।"

"তাঁর পুরো নামটা?"

“নীলোৎপল বা নীলরতন কিছু একটা...”

“ঠিক আছে। রাখ। কাল কথা হবে,” বলেই ফোন কেটে দিল ঝুলন। নোটনের পিঠে আলতো চাপড় মেরে বলল, শুয়ে পড়িস তাড়াতাড়ি। কাল ভোরবেলা উঠতে হবে কিন্তু।”

(৩)

পাকা রাস্তা ছেড়ে ডান দিকে বাঁক নিয়ে বেশ চওড়া একটা মেটে রাস্তা ধরল গাড়িটা। ঝুলন গুগল ম্যাপ খুলে বসে আছে ড্রাইভারের ঠিক পাশেই। পিছনে তাকিয়ে হেসে বলল, “আর একটুখানি। কপাল ভাল, নেট কানেকশনে কোনও সমস্যা নেই এ দিকে।”

“আমরা ঠিক কোথায় যাচ্ছি বলো তো?” বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন শঙ্খনাথ, “তুমি এত নিশ্চিত হচ্ছ কী করে যে বাবাকে এইখানেই পাওয়া যাবে?”

এ প্রশ্নটা নোটনেরও। ঝুলনদি তাকেও খোলসা করে কিছু বলেনি এখনও। কাকভোরে ফোন করে জাগিয়ে বলেছে, “আধ ঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়ে নিস। আমি আসছি। অদিতিদেরও বলে দিয়েছি। ওরা গাড়ি অ্যারেঞ্জ করে নিচ্ছে। সবাই মিলে চন্দ্রনাথদাদুর কাছে যাচ্ছি আমরা।”

“তিনি কোথায় জানতে পেরে গেছ?”
“হুঁ।”
“জায়গাটা কোথায়?”
“কমলপুর। রামনগর ছাড়িয়ে, উত্তরভাগের দিকে।”
“কী করে জানলে?”
“বলব। এখন সময় নেই। তড়িঘড়ি তৈরি হয়ে নে।”

ঝুলনদি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, “এইখানে, এইখানে। সাইড করে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিন দাদা।”

গাড়ি থেকে যেখানে নামা হল, সামনেই প্রচুর গাছপালা আর অনেকখানি জায়গা নিয়ে মস্ত একখানা বাগানবাড়ি। বাড়ির সামনের গেটে লেখা, ‘আকাশপ্রদীপ’।

গেটের বাইরে ডোর বেলে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। এক জন কম বয়সি ছেলে এক সঙ্গে এতগুলো মানুষকে দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়েই জিজ্ঞেস করল, “আপনারা?”

ঝুলন মিষ্টি হেসে বলল, "আমরা চন্দ্রনাথ গড়গড়ির বাড়ির লোক। তাঁকে নিতে এসেছি।"

"একটু অপেক্ষা করুন," বলেই ছেলেটা তার প্যান্টের পকেট থেকে ফোন বের করে কাকে জানি ফোন করল একটা। তার পর হেসে বলল, "আসুন।"

বাগান পেরিয়ে একটু এগোলেই বাংলো প্যাটার্নের ভারী সুন্দর একটা বাড়ি। বাড়ির চার দিকে অসংখ্য ফুল গাছ। শিউলি, টগর, গন্ধরাজ, জবা...

ঝুলনরা কয়েক পা এগোতে না-এগোতেই বাড়ি থেকে দু'জন বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন হাসি মুখে। অদিতি নিজেকে আর সামলাতে পারল না। দৌড়ে চন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছে অনুযোগের সুরে বলল, "ভেরি ব্যাড দাদু। বাড়ির লোককে এমন দুর্ভাবনায় কেউ ফেলে? আড়ি তোমার সঙ্গে, যাও।"

"সে কী!" চন্দ্রনাথের চোখে বিস্ময় ফুটল, "তোমাকে তো নিজের ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম আমি।"
"কোথায় দিয়েছিলে?" চোখ
পাকিয়ে বলে অদিতি, "একদম মিথ্যে
কথা বলবে না।"
"দিয়েছিলেনই তো," ঝুলন হেসে উঠল, "নইলে ওঁকে খুঁজে বের করলাম কী করে?"
"ঝুলন দিদিভাই, তাই তো?" চন্দ্রনাথ হাসলেন, "তোমার বুদ্ধির কথা দিদিভাইয়ের মুখে শুনেছি।"

(৪)

"এই বার ব্যাপারটা আমাদের বলো দেখি ঝুলন," 'আকাশপ্রদীপ'-এর লম্বা হল ঘরটায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে মুড়ি পকোড়া খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলেন শঙ্খনাথ। চন্দ্রনাথ এবং তাঁর বন্ধু নীলোৎপল সরকারও সায় দিলেন শঙ্খনাথের কথায়।

"বলছি," ঝুলন হাসল, "দাদু দিতিকে বলেই দিয়েছিলেন, তিনি যখন থাকবেন না, ওই গানগুলোর মধ্যেই তাঁকে খুঁজতে।"

"আমি তো ভেবেছিলাম..."

"মরে যাওয়ার কথা বলেছি, এই তো?" চন্দ্রনাথ অদিতিকে থামিয়ে দিয়ে হেসে উঠলেন

হো হো করে।

ঝুলন বলল, "আমিও প্রথমে বুঝতে পারিনি। নোটনই 'গীতবিতান'-এর মধ্যে থাকা নীলুদাদুর চিঠিটার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে," ঝুলন আড় চোখে নোটনের দিকে চেয়ে মুচকি হাসল, "ওর জন্যেই কিন্তু রহস্যটা ক্রমশ সহজ হয়ে গেল আমার কাছে।"

"কী রকম?" নীলোৎপল হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

"আপনার চিঠির শুরুতে ডান দিকে ছাপানো 'আকাশপ্রদীপ' আর তার নীচে এই কমলপুরের ঠিকানা।"

"একটু খোলসা করে বল না ঝুলন", অদিতি বলল।

"চলে আসার আগে দাদু পাঁচটা গান বার বার শুনতেন। একই ক্রমে। তাই তো?"

"হ্যাঁ," অদিতি মাথা নাড়ে।

"তোর জন্যেই দাদু এটা করতেন," চন্দ্রনাথের দিকে চাইল ঝুলন, "কী, তাই তো?"

"একদম," ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলেন চন্দ্রনাথ, "ঠিকানাটা দিদিভাইকে মুখস্থ করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।"

"মানে?" অদিতি বোকার মতো চেয়ে রইল ওদের মুখের দিকে।

ঝুলন হাসল, "ওই পাঁচটা গানের পঙ্‌ক্তিগুলোর প্রথম অক্ষর থেকে যেই 'আকাশপ্রদীপ' পেয়ে গেলাম, দাদু কোথায় আছেন নিশ্চিত হয়ে গেলাম আমি। আরও নিশ্চিত হলাম, যখন দেখলাম পাঁচটি গানের মধ্যে কেবল মাঝখানের গানটিই প্রকৃতি পর্যায়ের। বুঝলাম তিনি প্রকৃতির মধ্যে আছেন। শুধু তাই নয়, ওই গানে 'কমলবন'-এর কথাও রয়েছে। কমল এবং নীলোৎপল দুই মানেই তো পদ্ম। বুঝলাম নীলুদাদুর বাগানবাড়ি 'আকাশপ্রদীপ'-এই খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁকে।"

"সাবাশ," তারিফ করে উঠলেন চন্দ্রনাথ।

"ইস, এত সোজা?" অদিতি বলে উঠল।

"তোমার সুবিধের জন্যেই শক্ত ধাঁধা দিতে আমি চাইনি দিদি," চন্দ্রনাথ হাসলেন, "নীলোৎপলের চিঠিও ইচ্ছে করেই টেবিলে রেখে এসেছিলাম 'গীতবিতান'-এর মধ্যে।

জানতাম এ চিঠি তোমাদের চোখে পড়বেই। কিন্তু মানুষের এই এক মুশকিল, সহজ জিনিসকে কিছুতেই সে সহজ করে বুঝতে চায় না...”

“সবই তো হল। কিন্তু এমন করে আপনার বাড়ি ছেড়ে চলে আসার কী দরকার ছিল বাবা?” আলপনা জিজ্ঞেস করলেন, “আমাদের যে কী উদ্বেগের মধ্যে কেটেছে দুটো দিন...”

“প্রয়োজন তো ছিলই বৌমা,” চন্দ্রনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, “যে দিন ভার্গব এসে কবিগুরুর পাণ্ডুলিপির জন্যে পঞ্চাশ হাজার দর দিল আমার কাছে, স্পষ্ট দেখলাম শঙ্খর চোখ চক চক করছে। আমাকে সে বোঝানোর চেষ্টাও করেছিল, এই পাণ্ডুলিপি বেশি দিন সংরক্ষণ করা অসম্ভব। ওটাকে ডিজিটাইজ় করে রেখে দেওয়াই ভাল...”

“আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, রবীন্দ্রনাথের অটোগ্রাফের মার্কেট ভ্যালু এখন পনেরো-কুড়ি হাজারের বেশি নয়,” শঙ্খনাথ মাথা নিচু করে বললেন, “ভার্গব ফ্যান্সি প্রাইস হিসেবে পঞ্চাশ হাজারে রাজি হয়েছিল। ইদানীং আমার ব্যবসাটা ভাল চলছে না। ভেবেছিলাম এক সঙ্গে থোক পঞ্চাশ হাজার পেলে...”

“আর তার জন্যেই আপনি রাতের বেলা মাস্ক পরে...”

ঝুলনকে হাত তুলে থামিয়ে দিলেন চন্দ্রনাথ, “ও লজ্জার কথাটুকু থাক দিদি। আমি সে রাতেই ওকে চিনেছিলাম। জীবনে এত শক্‌ড আমি আগে কখনও হইনি। ইন ফ্যাক্ট তখনই সিদ্ধান্তটা নিই আমি এবং নীলোৎপলের সঙ্গে যোগাযোগ করি।”

“কী সিদ্ধান্ত দাদু?” অদিতি জিজ্ঞেস করল।

“আমি এই পাণ্ডুলিপি সরকারি সংগ্রহশালায় দান করে দিচ্ছি দিদি। নীলোৎপল সব ব্যবস্থা করছে।”

“দিয়ে দিচ্ছ?” হতাশ হয়ে বলল অদিতি।

“হ্যাঁ দিদি,” চন্দ্রনাথ মাথা নাড়েন, “চার দিক লোভী মানুষে ভরে উঠছে। সব কিছুরই মূল্য তারা টাকায় হিসেব করতে চায়। শঙ্খ ঠিকই বলেছে, আমাদের বাড়িতে এ জিনিস বেশি দিন সংরক্ষণ করা সত্যিই অসম্ভব...”

জয়ের পরে ট্রফি হাতে ধোনি ও জাডেজা

আবেগের নাম ধোনি

পাঁচ বার আইপিএল-জয়। মহেন্দ্র সিংহ ধোনির মতো দেশকে আবেগের সুতোয় এমন ভাবে কি আর কেউ বাঁধতে পারবেন? লিখেছেন মধুরিমা সিংহ রায়

মধুরিমা সিংহ রায়

শেষ ২ বলে প্রয়োজন ছিল ৯ রানের। স্ট্রাইকে বহু ম্যাচের মোড় ঘোরানো অভিজ্ঞ ফিনিশার রবীন্দ্র জাডেজা। আর উল্টো দিকে পর পর ২ বলে ২ উইকেট (যার মধ্যে একটি স্বয়ং মহেন্দ্র সিংহ ধোনির) তুলে প্রায় বিস্মৃতির অতল থেকে ফিরে আসা মোহিত শর্মা। শেষ ২ বলের প্রথমটিতে ৬, আর পরেরটিতে ৪। জাডেজার চওড়া ব্যাটে ভর করে জয়ের রান যখন এসে গিয়েছে, গোটা মাঠ যখন আনন্দে উদ্বেল, তখনও তিনি শান্ত। তবে তার খানিক পরেই আবেগের বাঁধ ভাঙবে তাঁরও। অধিনায়ক ধোনি খানিকটা স্বভাববিরুদ্ধ হয়েই যেন কোলে তুলে নেবেন জাডেজাকে। বৃষ্টিবিঘ্নিত আইপিএল ফাইনালের শেষ লগ্নের জন্য উপরওয়ালা যে এমন টান টান চিত্রনাট্য লিখবেন, তার আঁচ বোধ হয় আগে থেকেই একটু পাওয়া গিয়েছিল। প্রথমে ব্যাট করে গুজরাত টাইটানস তোলে ২১৪ রান। অমন পাহাড়প্রমাণ রান তাড়া করতে হবে, তায় আবার মাঝেমধ্যেই বাধ সাধছে বৃষ্টি! দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই কি তা হলে খানিকটা পিছিয়ে চেন্নাই? মোটেও না। যে দলটার অধিনায়ক মহেন্দ্র সিংহ ধোনি, তাঁর ধীর-স্থির-শান্ত ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া তো দলের বাকিদের মধ্যেও সঞ্চারিত হবে। ঋতুরাজ গায়কোয়াড় ও ডেভন কনওয়ে দারুণ শুরু করলেন।

অজিঙ্ক্য রাহানে বা অম্বাতি রায়াডুর মতো সেমি-রিটায়ারমেন্টে চলে যাওয়া দুই খেলোয়াড়ও যোগ্য সঙ্গত দিলেন। তার পর শিবম দুবে, আর রবীন্দ্র জাডেজা। বাকিটা ইতিহাস। পাঁচ নম্বর ট্রফি ঘরে তুলল চেন্নাই। তবে শুধুই কি আর একটি আইপিএল জয়ের জন্য মধ্য রাত পেরিয়েও গোটা দেশ জেগে ছিল সেদিন? এর পরের বছর আইপিএলে আদৌ ধোনি খেলবেন কি না, তা নিশ্চিত নয়। তাঁর আইপিএল-অবসর নিয়ে অনেক দিন ধরেই জল্পনা চলছে। যদিও ধোনি কাপ জয়ের পরে এক বারের জন্যও অবসরের বিষয়ে জানাননি। তাঁর থাকা না-থাকা পুরোটাই নির্ভর করছে পরের বছর ধকল সইতে পারার ক্ষমতার উপরে। এ বারের ফাইনালেও তিনি যে ক্ষিপ্রতায় স্টাম্প করলেন, তাতে অবশ্য বোঝা মুশকিল যে, তাঁর বয়স একচল্লিশ। কিন্তু, ধোনির সম্ভাব্য অবসরের কথা ভেবেই কি এক অদ্ভুত আবেগে জড়িয়ে গেল গোটা দেশ? আমদাবাদের স্টেডিয়ামে খেলা, কিন্তু চেন্নাইয়ের সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড়ে তা বোঝা দায়! একই দৃশ্য এর আগে এই আইপিএলে ইডেনও দেখেছিল। যেখানেই ধোনি, সেখানেই অকুণ্ঠ সমর্থন। ধোনি যখন কেরিয়ারের মধ্য-গগনে, তখনও যাঁরা তাঁর সে অর্থে ফ্যান ছিলেন না, তাঁরাও আজ শ্রদ্ধায় নত অধিনায়কের কাছে। শুধুই কি জয়ের সংখ্যা দিয়ে এই আবেগের পরিমাপ সম্ভব? জাডেজা জয় উৎসর্গ করছেন ধোনিকে, বিপক্ষের অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ড্যও বলে দিচ্ছেন গুরুর কাছে পরাজিত হয়ে কোনও আক্ষেপ নেই। এমন শ্রদ্ধা আর ভালবাসা কুড়োনো বোধ হয় শুধু মহেন্দ্র সিংহ ধোনির পক্ষেই সম্ভব!

জয়পুরে লেপার্ডের মুখোমুখি

জয়পুরের রোমাঞ্চকর আমাগড় ফরেস্ট ঘুরে লেপার্ডের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন **আবীর গুপ্ত**

ঠিক বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় শুরু হল সাফারি। সাফারির গাড়িতে ক্যামেরা বাগিয়ে রয়েছি আমি। সঙ্গে গাইড দুর্গালাল ভার্মা, এক জন ফরেস্ট গার্ড, দু'টি হিন্দি খবর-কাগজের দু'জন সাংবাদিক, এক জন ব্যবসায়ী যিনি জয়পুরের ঝালানা লেপার্ড সাফারি পার্কে সাফারির সমস্ত গাড়ি সাপ্লাই করেন এবং তাঁর এক জন চেলা। গাড়িতে পিছনে ছ'জন আর ড্রাইভারের পাশে এক জন। জয়পুরে তখন বেশ আলো, অন্ধকার নামেনি। ভাবছি লেপার্ডের দেখা পাব তো? কারণ, সে দিনই সকালে ঝালানা সাফারি পার্কে সাফারি করে লেপার্ডের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, ফটোসেশনও ভালই হয়েছে। একই দিনে দু'-দু'বার লেপার্ডের দেখা পাওয়া? এ রকম রেকর্ড আছে কি না জানা নেই। সব ভাবনা ভুলিয়ে দিল সাফারি-পথ, এ রকম ভয়ঙ্কর, সুন্দর, রোমাঞ্চকর সাফারি পথ আগে আর কখনও পাইনি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নানান জঙ্গলে সাফারির অভিজ্ঞতা আছে। প্রতিটি জঙ্গলেই এক বার নয়, দু'-তিন বার করে সাফারি করা হয়েছে। কিন্তু, এ রকম ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকর রুট? জীবনে প্রথম! সম্ভবত ভারতের সর্ব শ্রেষ্ঠ সাফারির অভিজ্ঞতা হতে চলেছে বুঝে সাবধান হতে হতেই সামনে বাঁ দিকে জলের ধারে চোখ আটকে গেল, বিস্ময়ে আনন্দে হতবাক হয়ে গেলাম।

এটা গল্প নয়, সম্পূর্ণ সত্যি ঘটনা। তা হলে খুলেই বলা যাক। সরকারি চাকরিতে গুজরাতে পোস্টেড, তাই ইচ্ছে হল ২০২২ সালের মে মাসে পাশের রাজ্য রাজস্থানে ওয়াইল্ডলাইফ ফটোগ্রাফি করতে যাওয়ার। রাজস্থান সরকারের বন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই ওঁরা বললেন, ওঁদের অতিথি হয়ে রাজস্থান যেতে, সর্বত্র ওঁরাই নাকি সব ব্যবস্থা করবেন! ঠিক হল প্রথমে মাউন্ট আবু যাব, গ্রিন মুনিয়ার খোঁজে। সেখান থেকে জয়সলমেরে গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড-এর ফটো তুলে সোজা জয়পুর। জয়পুরে প্রথম দিন নাহারগড় বায়োলজিক্যাল পার্কে ঘুরে দ্বিতীয় দিনে ঝালানা লেপার্ড সাফারি পার্ক। এই দু'দিনই সকালে প্রোগ্রাম, বিকেলটা ফাঁকাই কাটাতে হবে। সমস্যাটা অ্যাসিস্ট্যান্ট কনজার্ভেটর অফ ফরেস্টকে বলতেই উনি দুর্গালাল ভার্মার নাম ও ফোন নম্বর দিয়ে আমাকে বললেন, ওঁর সঙ্গে কথা বলে নিতে। উনি গাইডের কাজ করেন। শিক্ষিত মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর সঙ্গে কথা বলে গাড়িরও ব্যবস্থা করে নিলাম। জয়পুরে দ্বিতীয় দিন ঝালানা সাফারি পার্কে সাফারি করার পর খবর এল, এক মাত্র আমিই লেপার্ডের দেখা পেয়েছি। বাকি কারও এই সৌভাগ্য হয়নি। কারণও আছে। বন বিভাগের সৌজন্যে সমস্ত সাফারি যেমন ফ্রি ছিল, তেমনই সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল সবচেয়ে ভাল গাইড, সবচেয়ে ভাল গাড়ি

লেপার্ডের দেখা পেয়েছি। বাকি কারও এই সৌভাগ্য হয়নি। কারণও আছে। বন বিভাগের সৌজন্যে সমস্ত সাফারি যেমন ফ্রি ছিল, তেমনই সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল সবচেয়ে ভাল গাইড, সবচেয়ে ভাল গাড়ি আর সবার চেয়ে ভাল ড্রাইভার, যারা লেপার্ডের চালচলন সম্বন্ধে অতি মাত্রায় ওয়াকিবহাল।

সন্ধের মুখে জয়পুর শহর

দুপুরবেলায় দুর্গালাল ভার্মার সঙ্গে বার্ডিংয়ে বেরিয়ে পাগলের মতো প্লাম হেডেড প্যারাকিট অর্থাৎ ফুলটুসি পাখি ও ব্ল্যাক ফ্র্যাঙ্কোলিন অর্থাৎ কালো তিতির পাখির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরেও যখন পাওয়া গেল না, তখন দুর্গালাল ভার্মাই পরামর্শ দিলেন, আমাগড় ফরেস্টে যেতে। ওখানে নাকি শয়ে শয়ে প্লাম হেডেড প্যারাকিট উনি দেখেছেন! একটি বিশাল চওড়া উঁচু পাহাড় এবং তার আশপাশের বেশ কিছুটা অঞ্চল জুড়ে ঘন জঙ্গল- এই হল আমাগড় ফরেস্ট। আমাগড় ফরেস্টের গেটে আটকাল, কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। বেশ কিছু ক্ষণ ফরেস্ট গার্ডকে বুঝিয়েও যখন ফল পাওয়া গেল না, তখন বাধ্য হয়েই দুর্গাজিকে বলতে হল ওঁর ফোনটা দিতে। কারণ, আমার ফোনে কোনও নেটওয়ার্ক ছিল না। এসিএফ সাহেবকে ফোন করতেই উনি খেঁকিয়ে উঠলেন, "আপনাকে ফোনে পাচ্ছি না! কখন থেকে চেষ্টা করছি।"

ওঁকে বোঝানোর জন্য বললাম, "আসলে এখানে ফোনের নেটওয়ার্ক নেই।"

"এখন কোথায় আছেন?"

"আমাগড় ফরেস্টের গেটের কাছে।"

উনি বাকি কথা বলতে না দিয়েই বললেন, "আমাগড় ফরেস্ট! ওখানে কী করছেন?"

"দুর্গাজির সঙ্গে ব্ল্যাক ফ্র্যাঙ্কোলিন আর প্লাম হেডেড প্যারাকিটের খোঁজে এসেছি।"

"ওই গেটের সামনেই অপেক্ষা করুন, আমার অফিসাররা যাচ্ছে। আপনার জন্য একটা সারপ্রাইজ় আছে।"
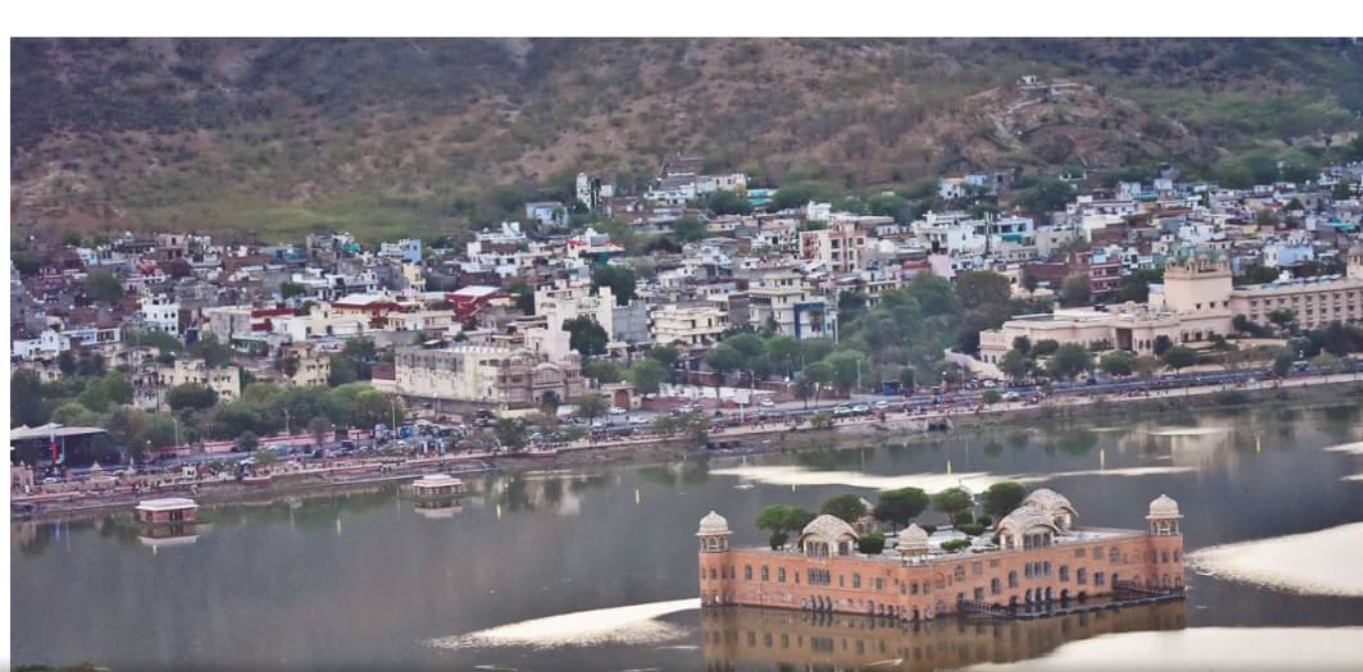
আমাগড় পাহাড়ের চূড়া থেকে জয়পুরের জলমহল

আধ ঘণ্টা বাদে বন বিভাগের গাড়িতে দু'জন মাঝবয়সি অফিসার এলেন। আমার কাছে এসে হ্যান্ডশেক করে যা জানালেন, তা শুনে আমার চোখ কপালে উঠে গেল। আমাগড় ফরেস্টে নতুন একটা সাফারি পথ বন বিভাগ তৈরি করেছে। বন দফতরের হর্তাকর্তারা ওই পথ ঘুরে গেছেন, কিন্তু জনসাধারণের জন্য খোলা হয়নি। এই কারণে গেটে এত কড়াকড়ি। সে দিনই নাকি তড়িঘড়ি প্রথম ট্রায়াল সাফারির বন্দোবস্ত করা হয়েছে। শুধু আমি নয়, সঙ্গে আরও কয়েক জন থাকবেন। তাঁদের খবর দেওয়া হয়েছে, তাঁরা আসছেন। সঙ্গে কারা ছিলেন, তা প্রথমেই বলা হয়েছে।

ট্রায়াল সাফারি শুরু হল। পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে রাস্তা বানানো হয়েছে। রাস্তা কংক্রিটে বাঁধানো নয়, বোল্ডার আর পাথরের টুকরোর উপর রোলার চালিয়ে তৈরি। রাস্তা সরু, দুটো গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারবে না। কয়েক জায়গায় অবশ্য চওড়া। রাস্তার এক দিকে ঘন জঙ্গলে ঢাকা পাহাড় আর অন্য দিকে গভীর খাদ। গাড়ি লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলেছে, ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকর ও সুন্দর সেই অভিজ্ঞতা। গার্ড জানালেন যে-কোনও সময় সামনে লেপার্ড চলে আসতে পারে। রাস্তার হাল দেখে মনে পড়ে গেল লাহুল-স্পিতি ভ্রমণের কথা। ওখানে জায়গায় জায়গায় রাস্তার পাশে বোর্ডে লেখা ছিল 'সরি ফর উহ আহ আউচ'। ২০০৯ সালে হিমাচল প্রদেশের বেশ কয়েকটি বেসরকারি টুর অপারেটর হিমাচল প্রদেশ পর্যটনকে জনপ্রিয় করার জন্য, বিশেষত লাহুল-স্পিতিকে জনপ্রিয় করার জন্য, আমাকে সপরিবারে সতেরো দিনের জন্য কল্পা-কিন্নর-লাহুল-স্পিতি ভ্রমণে পাঠিয়েছিল। কারণ, সেই সময়ে লাহুল-স্পিতি ভ্রমণ খুব একটা জনপ্রিয় ছিল না। শর্ত ছিল ফিরে এসে ওই ভ্রমণকাহিনি প্রকাশ করতে হবে। আমাগড় সাফারি রুট সম্ভবত ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাফারি রুট হতে চলেছে। এটা যখন ভাবছি, তখনই রাস্তার বাঁ দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় একটা ছোট পরিষ্কার জলের ডোবার মতো রয়েছে, তাতে চোখ আটকে গেল। কেন?
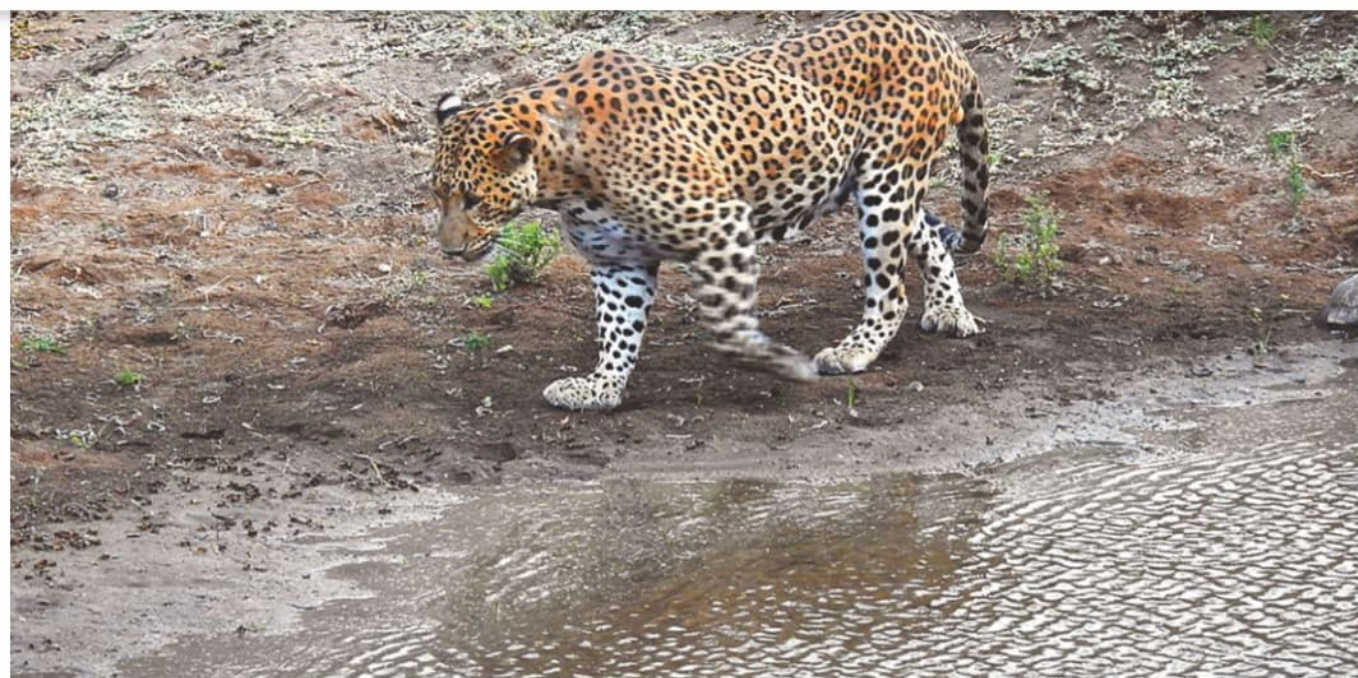
ক্যামেরার শাটারের আওয়াজে বিরক্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছে লেপার্ড

একটা লেপার্ড জল খাচ্ছে। ক্যামেরার বিশাল বড় লেন্সের স্থান হয়েছে দুর্গালালজির কাঁধে, তা না হলে ফটো তোলা যাবে না। ক্রমাগত কন্টিনিউয়াস শাটারে ফটো উঠে যাচ্ছে। ওর প্রতিটি মুভমেন্টের ফটো যে ক্যামেরায় থাকা দরকার। বোধ হয় শাটারের আওয়াজে বিরক্ত হয়েই লেপার্ড বাবাজি তড়াক করে লাফিয়ে পিছনের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

গাড়ি আবার ওই বিপজ্জনক পথে লাফাতে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলল। পথের ধারে গাছের উপর দেখা গেল গ্রিন বি-ইটারদের, ডালে বসে আছে। প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার যাওয়ার পর গাড়ি পৌঁছোল পাহাড়ে টপে। মাথার উপর বেশ কয়েকটি ব্লু-টেলড বি-ইটার উড়ে বেড়াচ্ছে। এটা নাকি সানসেট পয়েন্ট!

পর্যটকেরা সাফারি করতে করতে এখানে এসে চা-কফি খেতে খেতে সূর্যাস্তের শোভা আর চার পাশের দৃশ্য দেখবেন। আসার পথের সৌন্দর্য আগেই বলা হয়েছে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে পুরো জয়পুর শহরটাকে। ক্যামেরাবন্দি হল একটি ইঁদুর। গাড়ি যখন শীর্ষে পৌঁছেছে তখন সূর্যাস্ত হতে চলেছে, তাই পটাপট ফটো উঠতে থাকল ক্যামেরায়। ওই অল্প আলোয় সেমি-ডিএসএলআর ক্যামেরায় ফটো উঠতে থাকল জয়পুরের জলমহল বা অন্যান্য দৃশ্যের। কারণ, ডিএসএলআর ক্যামেরার লেন্স বদলে ফটো তোলার সময় নেই। অন্ধকার বলে জায়গায় জায়গায় আলোর রোশনাই- এক কথায় অপূর্ব! প্রত্যেকে অভিভূত আর সকলের মুখ দিয়ে একটাই কথা, “এই আমাগড় লেপার্ড সাফারি সবাইকে টেক্কা দেবে!”

চা খেয়ে ফেরার পালা। ক্যামেরায় পূর্ণিমার চাঁদের ফটো তুলে রওনা দেওয়া হল। ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেছে। পৃথিবীর সর্বত্র নাইট সাফারি বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ, ওতে বন্যপ্রাণীদের অসুবিধে হয়। সার্চলাইটের আলো জ্বালানো তাই নিষিদ্ধ। এখানে নাইট সাফারির অভিজ্ঞতাও পর্যটকেরা পাবেন। কারণ, সূর্যাস্ত দেখে ফেরার সময় অন্ধকারের মধ্যেই ফিরতে হবে। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো। সার্চলাইট জ্বালানো যাবে না, গাড়ির হেডলাইটই ভরসা।

বিকেলের জয়পুর শহর

গাড়ি থেমে গেছে, দূরে বাঁ দিকে অন্ধকারের মধ্যে এক জোড়া ছোট্ট আলো জ্বলছে! হায়নার চোখ! ক্যামেরায় ফটো তোলা সম্ভব নয়, তাই শুধু উপভোগ করা ছাড়া উপায় কী। গার্ড জানাচ্ছিলেন, পুরো সাফারি পথটা প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার হবে। একই সঙ্গে নীচ থেকে সব সাফারির গাড়ি ছাড়বে আর সূর্যাস্ত দেখে একই সঙ্গে ফিরবে। এই জঙ্গলে প্রায় তিরিশটির মতো লেপার্ড আছে। সংখ্যাটা বাড়তেও পারে। কারণ, শেষ গণনা প্রায় সাত-আট বছর আগে হয়েছে। গাড়ি হঠাৎ থেমে গেল, ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে ফিস ফিস করে কী যেন বলছে! সামনে একটা লেপার্ড রাস্তা পেরিয়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকে গেল। গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। যখন থামল, তখন ফরেস্ট গার্ড জানালেন সাফারি

শেষ হয়েছে। সময় তখন রাত ঠিক ৯টা বেজে ২৫ মিনিট।

আমাগড় সাফারির পুরো সাফারি পথটাই পাহাড় কেটে বানানো হয়েছে। জিলিপির প্যাঁচের মতো ঘুরে ঘুরে রাস্তা উপরে পাহাড়ের চুড়োয় উঠে গেছে। পুরো রাস্তার এক দিকে খাদ, অন্য দিকে জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়। এই রকম সাফারি রুট জানি না, ভারতের আর কোথাও আছে কি না। সম্ভবত ভারতের সর্ব শ্রেষ্ঠ লেপার্ড সাফারি রুট। সর্ব শেষ যা খবর, আমাগড় লেপার্ড সাফারি চালু হয়ে গেছে এবং জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এটি জয়পুর শহরের মধ্যে অবস্থিত। জয়পুর রেলওয়ে স্টেশন মাত্র এগারো কিলোমিটার দূরে। তাই জয়পুর গেলে আমাগড়ে লেপার্ড সাফারি এক বার করতে ক্ষতি কি?

.

ফটো: লেখক
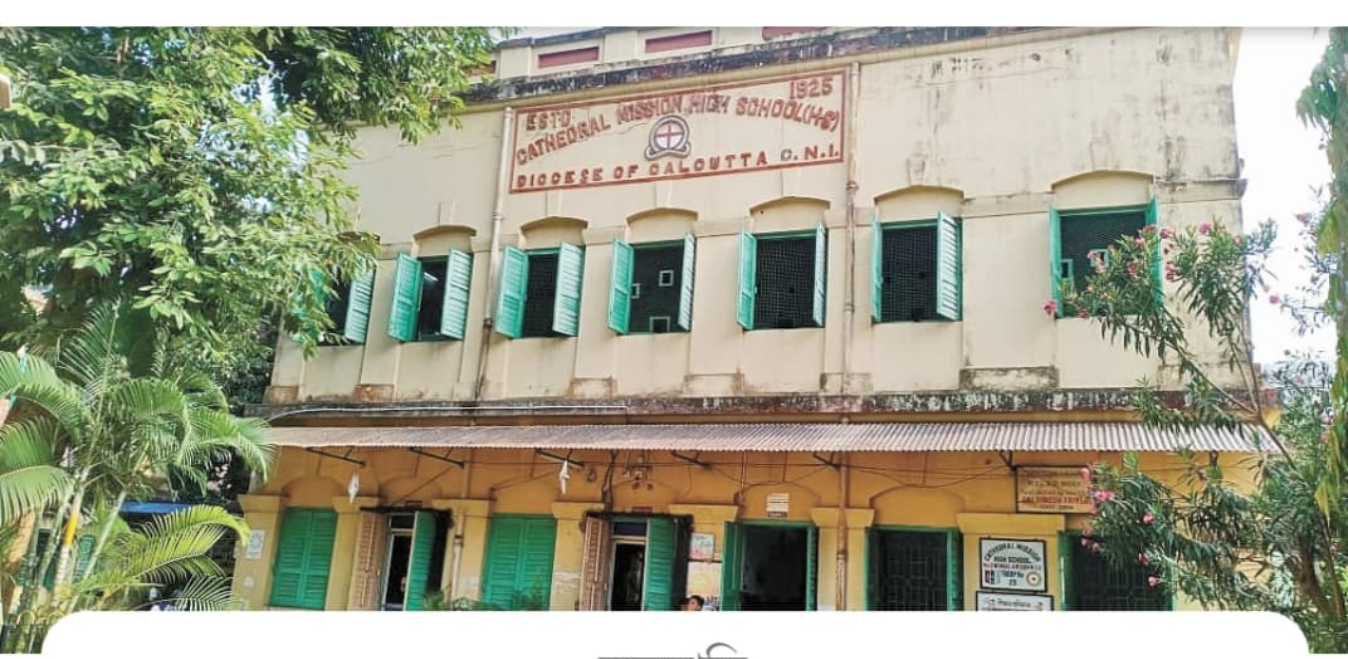
স্কুলবাড়ি

আমার স্কুল

লেখাপড়া থেকে খেলাধুলো... ঐতিহ্যকে সঙ্গী করেই এগিয়ে চলেছে একশো ছুঁতে চলা স্কুলটি।

ক্যাথিড্রাল মিশন হাই স্কুল

ক্যাথিড্রাল মিশন হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৫ সালে। কলকাতার ভবানীপুরে। অর্থাৎ স্কুলটির বয়স প্রায় একশো ছুঁই ছুঁই। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রেভারেন্ড ক্যানন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে এটির নাম ছিল সেন্ট মেরি স্কুল। তখন তা শুধুই গির্জার অধীনে থাকা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। পরে তা-ই রূপ নেয় ক্যাথিড্রাল মিশন হাই স্কুলের। তবুও শুরুতে দশম শ্রেণি পর্যন্তই পড়ানো হত। তারও পরে প্রাথমিক স্তরটি ডায়োসিস অব ক্যালক্যাটার অধীনে থেকে যায়। আর পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অংশটি সরকার-পোষিত বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বর্তমানে ক্যাথিড্রাল মিশন একটি ইংরেজি মাধ্যম সরকারি স্কুল। কেবল বাংলা ভাষা-ভাষীরাই নয়, এই স্কুলে ভিন রাজ্য থেকেও ছাত্র পড়তে আসে। কলকাতা ডায়োসিসের বিশপ রাইট রেভারেন্ড ড. পরিতোষ ক্যানিং এই স্কুলের চেয়ারম্যান। তাঁরই ২০১৫-এর পরিকল্পনাকে সামনে রেখে এই স্কুলের প্রধান

ক্যাথিড্রাল মিশন হাই স্কুল

ক্যাথিড্রাল মিশন হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৫ সালে। কলকাতার ভবানীপুরে। অর্থাৎ স্কুলটির বয়স প্রায় একশো ছুঁই ছুঁই। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রেভারেন্ড ক্যানন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে এটির নাম ছিল সেন্ট মেরি স্কুল। তখন তা শুধুই গির্জার অধীনে থাকা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। পরে তা-ই রূপ নেয় ক্যাথিড্রাল মিশন হাই স্কুলের। তবুও শুরুতে দশম শ্রেণি পর্যন্তই পড়ানো হত। তারও পরে প্রাথমিক স্তরটি ডায়োসিস অব ক্যালক্যাটার অধীনে থেকে যায়। আর পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অংশটি সরকার-পোষিত বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বর্তমানে ক্যাথিড্রাল মিশন একটি ইংরেজি মাধ্যম সরকারি স্কুল। কেবল বাংলা ভাষা-ভাষীরাই নয়, এই স্কুলে ভিন রাজ্য থেকেও ছাত্র পড়তে আসে। কলকাতা ডায়োসিসের বিশপ রাইট রেভারেন্ড ড. পরিতোষ ক্যানিং এই স্কুলের চেয়ারম্যান। তাঁরই ২০২৫-এর পরিকল্পনাকে সামনে রেখে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সিম্পসন মোল্লা জানান যে, সমাজের পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের ইংরেজি মাধ্যমে (সরকারি অনুদান-প্রাপ্ত) শিক্ষাদানই তাঁদের লক্ষ্য। মাধ্যমটা ইংরেজি হলেও এখানে পড়ার খরচ খুবই সামান্য। আসলে মিশনারিদের আদর্শই ছিল কম খরচে ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করা। এই স্কুলও তাতেই বিশ্বাসী। প্রধান শিক্ষকের মতে, বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর চেয়ে তাঁরা এখানেই আলাদা হয়ে যান।

প্রধান শিক্ষক সিম্পসন মোল্লা

লেখাপড়া চলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঠনপাঠন-রীতি মেনে। তবে এই স্কুল আলাদা করে ছাত্রদের আচার-আচরণের উপরও জোর দেয়। লোয়ার কেজি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সব মিলিয়ে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ন'শোরও বেশি। তবে কলা বা বাণিজ্য নয়, দ্বাদশ শ্রেণিতে কেবল বিজ্ঞান বিভাগটিই পড়ানো হয়। সেই সঙ্গে রয়েছে রসায়ন, জীববিদ্যার ল্যাবরেটরি। তবে এগুলো আরও বেশি উন্নত করতে চান স্কুল কর্তৃপক্ষ। যেমন কম্পিউটার ল্যাবরেটরিতে সেই বদলটা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। কারণ এই সব অনুন্নত শ্রেণির ছাত্রদের হাতে-কলমে কম্পিউটার শেখার একটাই জায়গা— স্কুল। স্কুল থেকে ঠিক মতো প্রশিক্ষণ পাওয়ায় তারা অনেকেই কম্পিউটার সায়েন্স পড়ার দিকেও ঝুঁকছে।

একশো বছর ছুঁতে চলা স্কুলটির গ্রন্থাগারও অনেকটাই পুরনো। তবে তা বেশি ব্যবহার করতে পারে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্ররা। কারণ ঘরের অভাব। তাই একাদশ-দ্বাদশের পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত বই-ই বেশি রয়েছে। তবে কর্তৃপক্ষ চান, তা বাকি ছাত্রদেরও আওতায় আসুক। তাদের বই পড়ার একটা অভ্যেস গড়ে উঠুক।

শিক্ষিকার সঙ্গে ছাত্ররা

প্রতি বছর মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকে উল্লেখযোগ্য ভাবে ভাল ফল করে এই স্কুল। গত বছরই মাধ্যমিকে এই স্কুলের ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৯৫ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিকেও গত বছর এই স্কুলেরই এক ছাত্র পেয়েছিল প্রায় ৯৬ শতাংশ নম্বর। এরা একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকেই স্কুলেরই ছাত্র। পরবর্তীতে এই স্কুলের অনেকেই জয়েন্ট এন্ট্রান্স, নিট পরীক্ষাতেও ভাল ফল করেছে।

বছর জুড়ে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। পালিত হয় নেতাজি জন্মজয়ন্তী, প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস। তবে টিচার-ইন-চার্জ নন্দিতা চৌধুরী জানালেন, বর্তমান প্রধান শিক্ষক আসার পরই অনেক বেশি ধুমধাম করে পালিত হচ্ছে ২৩ জানুয়ারি ও ২৬ জানুয়ারির অনুষ্ঠান। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনও। এতে ছাত্ররা তো বটেই, এমনকি শিক্ষক-শিক্ষিকারাও অংশ নিয়ে থাকেন। গত বছর থেকে পুজোর ছুটির আগে এক নতুন ধরনের অনুষ্ঠান শুরু করেছে স্কুল। রঙের উৎসব। ছুটি পড়ার আগের দু'দিন ধরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছাত্ররা কেউ গান করে, কেউ বা ছবি আঁকে আবার কেউ আবৃত্তিও করে। হয় কুইজ় প্রতিযোগিতাও। আবার বড়দিনকে ঘিরেও হয় অনুষ্ঠান। বড়দিনকে অন্য মাত্রা দিতে আগে ক্যারল উৎসব হত স্কুলে। এখনও নানা ধরনের ক্যারল নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। হালে বড়দিন উপলক্ষে একটা বড় ধরনের অনুষ্ঠানও করা হয়, 'ক্রিসমাস ট্রি সেলিব্রেশন'। অনুষ্ঠানের শেষে সে বারের বিদায়ী ছাত্ররা ও অন্য সবার জন্য থাকে ক্রিসমাস ডিনারও। মার্চ মাস পড়তেই শুরু হয়ে যায় বসন্ত উৎসবের তোড়জোড়। নিজের স্কুলের অনুষ্ঠান তো রয়েছেই। সেই সঙ্গে আশপাশের অন্যান্য গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের সঙ্গেও বসন্ত উৎসবের নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে এই স্কুলের ছাত্ররা। এমনকি পেয়েছে প্রথম পুরস্কারও। স্কুলে রয়েছে এনসিসি ডিপার্টমেন্টও। এই স্কুলের এনসিসি করা ছাত্ররা অনেক বারই রাজ্যপালের কাছ থেকে পুরস্কার পেয়েছে। অংশ নিয়েছে ঐতিহ্যবাহী রেড রোডের প্যারেডেও।

স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

এখানে হাতে-কলমে পরিবেশ-সচেতন করে তোলা হয় ছাত্রদের। ছাত্রদের গাছ লাগাতে নিয়মিত উৎসাহ দেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। ছাত্ররা নিজেরাও গাছ কিনে স্কুলে টবে বসায়। নিয়ম করে জলও দেয়। সবুজ দিয়ে ঘেরা স্কুল ছাত্রদের কাছে আরও আকর্ষক হয়ে উঠবে, এমনটাই মনে করেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।

গত বছর থেকে স্কুলে রেড, ইয়েলো, ব্লু, গ্রিন... এই চারটে হাউজ় তৈরি করা হয়েছে। প্রতি হাউজ়ের ছেলেদেরই নানা রকম অ্যাক্টিভিটি, হাতের কাজ করতে দেওয়া হয়। এমনকি প্রতিযোগিতাও হয়। যে হাউজ় সবচেয়ে ভাল করে, তারা প্রশংসাও কুড়োয়। তবে যে কম ভাল করে, তাদেরকেও সমান ভাবে কাজে উৎসাহ দেওয়া হয়।

মিউজ়িক ক্লাস এই স্কুলের কাছে একটা গুরুত্বের দাবি রাখে। তাই শনিবার, ছুটির দিনেও স্কুলের ছাত্ররা স্কুলে আসে সেই ক্লাস করতে। গান শেখানো তো হয়ই। হয় ক্যারল গ্রুপের ভোকাল গ্রুমিংও। এ ছাড়া গিটার, সিন্থেসাইজ়ার শেখানোরও ব্যবস্থা রয়েছে। ভবিষ্যতে ছাত্রদের বেহালা ও আবৃত্তির প্রশিক্ষণও দেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষের।

খেলাধুলোতেও এগিয়ে থাকে পড়ুয়ারা

খেলাধুলোতেও বরাবরই এগিয়ে এই স্কুল। তিন বারের সিএবি চ্যাম্পিয়নও হয়েছে। একটা সময় জেলা স্তরের ফুটবলেও অংশ নিয়েছে স্কুলের ছাত্ররা। জেলা স্তরে সাঁতার, বক্সিং, রোয়িংয়েও গেছে প্রচুর ছাত্র। তাই সংবাদপত্রের খেলার পাতাতেও উঠে এসেছে এই স্কুলের নাম। করোনার সময় কিছুটা থমকে গেলেও, এখন আবার নতুন উদ্যমে খেলায় মন দিয়েছে স্কুলের ছাত্ররা। বিনামূল্যে নিয়মিত ক্রিকেট কোচিংয়ের ব্যবস্থাও শুরু হয়েছে। তবে স্কুলটির নিজস্ব মাঠ নেই। যদিও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কখনও তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। যেমন, এই বছর সেটা আরও ভাল ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল চার্চের মাঠে।

মাদার টেরিজা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড কমিটি থেকে সমস্ত সরকারি স্কুলের মধ্যে 'সবচেয়ে ভাল অনলাইন ক্লাস নেওয়া স্কুল'-এর তকমাও পেয়েছে এই মাইনরিটি স্কুলটি। লেখাপড়া থেকে খেলাধুলো সব নিয়েই একশোর ইতিহাস ছুঁয়ে আরও লম্বা পথ হাঁটার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে ক্যাথিড্রাল মিশন হাই স্কুল।